The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়—৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতিসংখ্যা ৭৫ প. | ৭ম বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৭৪ | বার্ষিক—সডাক ৪৲ টাকা মাত্র

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'—সূচীপত্র, বৈশাখ, ১৩৭৪

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	নবজন্ম (পদ্য)	শ্রীবরদাকুমার মজুমদার	১
২।	সম্পাদকীয়		২
৩।	আলোর বিকাশ	কথাশিল্পী শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র	৪
৪।	ঘৃতবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র	কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর	৫
৫।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান-সূচী		১১
৬।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির বিবৃতি		১৪
৭।	আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী		১৮
৮।	Seminar on M. M. Bijoyratna Sen and his technique of Ayurvedic treatment		২৪
৯।	মধুমেহ	কবিরাজ শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ এম.এ.	২৭
১০।	আরোগ্যশালায় চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীসুধাকান্ত রায়	৩২

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

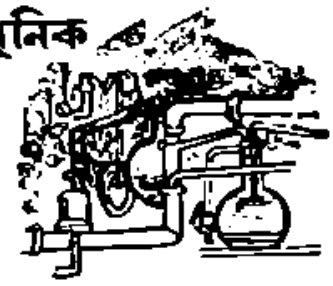

বাত রক্ত ও ধবল রোগ আরোগ্য

ইহা ছাড়া গাত্রে চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙ্গুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় পুস্তক পাঠ করুন

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৪১)

শাখা :—৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক ১ম সংখ্যা | বৈশাখ—১৩৭৪ April-May—1967 | ৭ম বর্ষ Vol. VII, No. 1

নব জন্ম

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হতে কতবার
জনম লভি বিচিত্রের ঝরেছি সকার
নিত্য নব নব রূপে অতীতের বক্ষ ভেদি
জেগে উঠি সহস্র কল্পনায় আদি-অনাদি
আমি ভাতি আমার গড়া অমৃতের দূত
শূন্য গৃহে আলি বাতি করি পরাভূত
আশার ছলনে—

শঙ্কিত চিত্তনীড়ে ঝরণের আস্ফালনে
জাগ্রত কত কথা, কত ব্যথা সংগোপনে—
নাহি ঘর আমার, নাহি বাহির—গৃহহারা
উদ্যানে ফুটে থাকি ফুলের মত—সর্বহারা
বিরহের তীক্ষ্ণ বাণে লভেছি ব্যর্থতা
মিলে গেছি সব সাথে বিমুক্ত বারতা
নিরাশ গহনে—

মুকুলিত সান্ধ্য কলিকা আনন্দেরি ছন্দে
অনুরাগ-সিঞ্চিত চির-আমোদিত গন্ধে
ব্যথাতুর শীতের বিরুপবশে রসহীন
ভিক্ষা মাগি শুষ্ক ধরণীর নিঃস্ব নবীন
বসন্তের দখিন হাওয়ার সোহাগে
রাঙিয়ে দিতে পারি যদি সৃষ্টির যজ্ঞে
অকালবোধনে !

১১ই পৌষ, ১৩৭২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

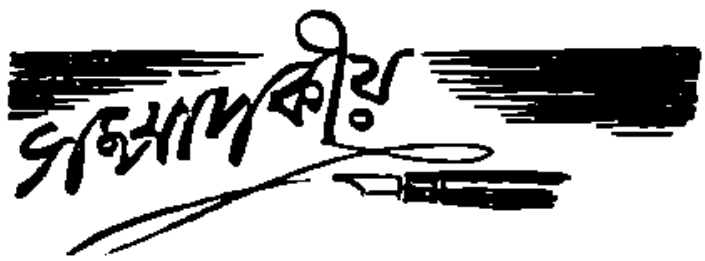

এক একটা যুগ আসে, তাতে মনে হয় যেন চাঞ্চল্য ও বহির্মুখিতাই সর্বস্ব—নিজের কিছু দান করবার থাকে না—শুধু চর্বিতচর্বণ ও অনুকরণের দাসসুলভ প্রবৃত্তি জাগ্রত করে। তার ভাল মন্দের বিচার নেই। সহজ জীবনের সাবলীল গতি সুস্থ প্রতিভার দ্বার অর্গলিত করে। ইহা বিজ্ঞানে যেমন ধর্ম অর্থনীতি প্রভৃতিতেও তেমন। সৃষ্টির বৈচিত্র্য সাধনার বহুমুখী ধারার পরিচয়। যে ঐক্যের কথা বলা হয় তা একান্ত বাহ্যিক, অন্তরের বিভিন্নতা—মনন ও চিন্তনের ও অনুভূতির বিভিন্ন উপলব্ধি নিত্য নূতনের আনন্দ লোক ও সৃজনের সমারোহ ও বিস্ময় এনে দিচ্ছে কিন্তু তাতে নেই সংহত মনের সুনির্দিষ্ট দিগ্‌দর্শন। ফলে পদে পদে পণ্ডশ্রম ও ব্যর্থস্বপ্নের আত্মঘাতী নির্বীর্যতায় কল্পনার আজ সমাধি হয়। তবে সৃষ্টি তাতে একটা হয়—তা ক্ষণস্থায়ী হোক, আর অন্তঃসারশূন্যই হোক।

আবার এমন যুগ আসে তার পলি সমস্ত দেহ মনকে নব জাগরণের প্রভায় উদ্দীপিত করে তোলে। অন্তত কয়েক শতাব্দি সেই প্রতিভার প্রভাব স্থায়ী দিগন্তের তমিস্রতা বিনষ্ট করে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র প্রকাশের দীপালী ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয়—তা অনেক সময় দুঃখের মধ্য দিয়ে মৃত্যু বা দুর্দৈবের আঘাতে আতশবাজির মত চকমক করে ওঠে। সেই ক্ষণিক তড়িৎসদৃশ সৃষ্টির প্রভাবে জড়তাগ্রস্ত মানব চরিত্র মাঝে মাঝে জাগ্রত হয় নব নব প্রকাশের উদ্যোগে। কিন্তু নব সৃষ্টির নিষ্ফল কল্পনায় যখন প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জলাঞ্জলি দেয়, তখন পাওয়াকে ছাড়তেই হয়, পাওনা ও সাধনার পাদপীঠ বানচাল হয়ে, অনর্থক সৃষ্টি করে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন—আর উদ্দেশ্য থাকলেও স্বার্থক্লিষ্ট ও লীহিত প্রচেষ্টায় মহৎ আবিষ্কারে ও অবদানে মহিমান্বিত ও হয়ই না; বরং অযথা বিভ্রান্তির জৈন্যে হৃতসর্বস্ব হয়। ত্যাগের জয়মালা যখন পাওনার ঘরে কবাটবিতে পর্যবসিত হয়, তখন লাভ হয় অতি সামান্য, ক্ষতি হয় বিস্তর—অর্থ ও মর্যাদার আনুকূল্য কিছুটা লক্ষিত হতে পারে দৃষ্টিহীন ও জ্ঞানহীনদের কাছে—আসল সত্যের শ্রেয় ও প্রেয়ের অভিব্যক্তি পিছিয়ে যায়। এমনি করে লাভের আশায় অনেকে অনেক কিছু হারিয়েছে এবং চিরদিন সেই ভুলের ফসল মর্মান্তিক নিষ্ফলতার কুপজলে নিমজ্জিত হয়েছে।

আয়ুর্বেদের নীতি ও প্রকৃতি, প্রয়োগবিধি ও প্রগতির পন্থা অনন্য। তাকে বিদেশী বাঁচে উৎকর্ষের দাবানলে অস্থেষ্টিক্রিয়ার সম্মুখীন না করে তার পথে চলতে দিতে হবে—সেখানেই তার বিজ্ঞানের সাফল্য—সেখানেই তার ফলপ্রসূতার অগ্নিপরীক্ষা। আয়ুর্বেদ হোমিওপ্যাথী নয়, ডাক্তারীও নয় কিন্তু নীতির সমগ্রতায় আয়ুর্বেদকে অতিক্রম করবার প্রতিভা কারোই নেই। সময়ানুক সার্থকতার বিজ্ঞানকে অসময়ানুক বিজ্ঞানের ধারায় টেনে নিলে

তার পরিসমাপ্তি কত সত্য হয়ে দাড়াবে—তার চলবার পথ আগাছায় আচ্ছন্ন হবে—ফলবন্ত বৃক্ষের শীতল ছায়া ও মিষ্টি ফলের স্বাদ হতে বঞ্চিত হতে হবে—কণ্টকাকীর্ণ অঙ্গনই হবে অজ্ঞ পশুচারীর মোড়লীর স্থান। আসল কথা, সাধনার শ্রমসাধ্য একনিষ্ঠতার পথিক না হয়ে ধারকরা বিদ্যার মূল্যহীন ঔদ্ধত্য অরাজকের রাজনীতি সৃষ্টি করতে পারে—বিজ্ঞান সাধনার প্রশস্ত ভূমির উন্মেষ করতে পারে না। আজ যারা চিন্তাশীল আয়ুর্বেদের গূঢ় রহস্য উদ্ধার করতে সিদ্ধহস্ত, তাদের শিক্ষায়তনের দ্বারপাল নয়, অন্দর মহলের রত্নের জহুরী হতে হবে।

এ একটা বিস্ময়ের বিষয়, যারা ক্ষমতাসীন তারা সর্ব বিষয়ে পারঙ্গম। মন্ত্রী হলে ত কথাই নাই—গুরুগিরি থেকে বৈজ্ঞববন্দনা সর্ব কার্যেই তাদের সমান অধিকার। জ্ঞান না থাকলেও জ্ঞান দেবার বাহন জোটে। কিন্তু আসল তাদের কর্তব্য—দেশের ও দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য আশ্রয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিধানের দক্ষতা ও আপ্রাণ প্রচেষ্টা বড় দেখা যায় না। আয়ুর্বেদের উন্নতি করতে হবে—অনেক ধরাধরির পর একটা আয়ুর্বেদ বিল হল। তাও পূর্ণাঙ্গ হলো না। তারপর তাকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা নেই। আষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজকে সরকারী কলেজে পরিণত করা হলো—আয়ুর্বেদানুগ কোন উন্নতির চিহ্ন এখন পর্যন্ত চোখে পড়ে না। আর আয়ুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ-সেবীদের দোষ ত্রুটি ধরতে কেহই পরাঙ্মুখ নয়। একবার গিয়ে দেখুন—অধ্যাপক ডিমনষ্ট্রেটর কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি সর্বাঙ্গীন শিক্ষার কী আয়োজন এবং তারা কে কি সুযোগ ও বেতন পান!

চিকিৎসাজগতে ডাক্তারেরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী! সরকারী যে কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তারা অগ্রণী, অথচ তারা ডাক্তারী ছাড়া জানেন না। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ব্যতীত ক্ষমতা (সাংবিধানিক কর্তব্য-বশত) ডাক্তারদের মত কেপ কমোরিন থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত একচ্ছত্রাধিপতি আর কেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদে কয়েকজন ডাক্তার মনোনীত আছেন। তাদের সেখানে কি কাজ আছে জানি না, কেন না, পরিষদ বর্তমানে পরীক্ষার অধিকর্তা—আর আয়ুর্বেদে তাদের স্থান কেন। আয়ুর্বেদীয় কলেজে আয়ুর্বেদ ও ডাক্তারী শিক্ষা পাশাপাশি চলে—অথচ আয়ুর্বেদের নীতি ও চিকিৎসার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন; বরং আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে আয়ুর্বেদের মতবাদের তারতম্য বুঝিয়ে আয়ুর্বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত করবার ব্যবস্থা সমীচীন। এতে আয়ুর্বেদের অবনতি ও ছাত্ররা আয়ুর্বেদে অনভিজ্ঞ অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। একজন পণ্ডিত অভিজ্ঞ কবিরাজ অধ্যাপকই বলেছেন—এর পর চরক সুশ্রুত বাগভট ইত্যাদি পড়াবার অধ্যাপক মিলবে না—ফলে কবিরাজী চিকিৎসা অচল হয়ে উঠবে। সুতরাং নূতন করে চিন্তা করবার সময় এসেছে। এখন হতে ইহার আমূল পরিবর্তন করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদের ফাকালটি হলে তা হবে নিছক আয়ুর্বেদের মৌলিক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা ও প্রগতিশীল অনুশীলনের কেন্দ্র। আয়ুর্বেদের নীতি ও ধারায় সংমিশ্রণের বন্ধ্যা নীতি সেখানে অনুসৃত না হয়, তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এতে ডাক্তার বা ডাক্তারীর প্রতি কোন অসৌজন্য বা অমর্যাদার কারণ নেই। ভারতবাসী হিসেবে তাদেরও লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে এই ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান, তার অনন্য চিকিৎসা-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ থাকে। তাতে তাদেরই গৌরব জগত সভায় তার বহুমুখী চিন্তা মননশীলতা তথ্যধারা দর্শনশৈলী এবং ফলপ্রসূ চিকিৎসা বৈশিষ্ট্য।

বস্তুতঃ আয়ুর্বেদ শিক্ষার যে পাঠ্যতালিকা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত তাতে ছ'ঘোড়ায়-চড়া অশ্বারোহীর মর্মান্তিক দুরবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। বেশ পাকা করে ছাত্রকে দুইটী বিজ্ঞানে পণ্ডিত করে তোলার দূরদৃষ্টিহীন ব্যর্থ প্রচেষ্টা—যা হতে পারে না—হবে না কোন দিন ; ফলে ডাক্তারী-প্রধান মূলহীন আয়ুর্বেদ মায়ামৃগের পশ্চাতে শক্তি ও মস্তিষ্কের অপচয়। প্রয়োজন ছিল এবং যা প্রতিষ্ঠাতা-বৈদ্যার্ণবদের উদ্দেশ্য ছিল তা হলো আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের পথে পরিপূরক-হিসেবে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের যতটুকু গ্রহণ করা হবে তাই। আয়ুর্বেদের নীতিগত করে শিক্ষা দেওয়া যাতে আয়ুর্বেদরূপ মহাসাগরে মিলিত হয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রাধান্য ও যথার্থতা পরিস্ফুট হয় এবং ছাত্রদের মতিগতি শিক্ষার মূল দৃষ্টিভঙ্গি আয়ুর্বেদের মধ্যে নিবিষ্ট থেকে ভাবী আয়ুর্বেদের গতিশীল ঐশ্বর্যের পথ নির্দেশ করে। মূলকথা, আয়ুর্বেদীয় বিদ্যায়তনে আয়ুর্বেদেতর বিজ্ঞানকে যতটুকু প্রয়োজন আয়ুর্বেদের কষ্টিপাথরে যাচাই ও বাছাই করে স্বাঙ্গীকরণ করে নেওয়া। তা হয়নি—সে পথে চালাবার শিক্ষকেরও হয়ত অভাব। তা না হলে এখনও কেন আয়ুর্বেদ ও ডাক্তারী পড়াবার জন্য দুটী ভিন্ন শ্রেণীর অধ্যাপক আছেন। এখনও অবহিত হবার সময় আছে। ঐ পথে আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের শিক্ষা এই মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় আরও—যেখানে আয়ুর্বেদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই ঔষধব্যবস্থায়ও ১নং ২নং বলে ঔষধের নাম লেখা হয় ; কারণ মিশ্র ঔষধের নাম মিথ্যাই হবে। আধুনিক কবিরাজগণ যদি মিশ্র ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন—যা কোন বিজ্ঞানভিত্তিক নয়, তবে মর্যাদাও পেতে পারেন না। স্বাঙ্গীকরণের পথ না পেয়ে এই পরগাছার আক্রমণে আয়ুর্বেদের সাধনা স্তিমিত হচ্ছে—নামেই আয়ুর্বেদ কলেজ থাকবে—কাজে ডাক্তারী কলেজে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং আজ সকলের কাছে অনুরোধ বর্তমানের কলেজী-শিক্ষায় ডাক্তারী মিশ্রিত আয়ুর্বেদ পঠন-পাঠনের ব্যবস্থার অবসান করুন, তবে আয়ুর্বেদ রক্ষা পাবে।

আলোর বিভাস

দার্শনিক কথা শিল্পী শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র

যুগ যুগ অহর্নিশ
হারানীল পথ পেরিয়ে
অতীত ঐতিহ্য নিয়ে
আয়ুর অবদানে আজো বিধৃত
আয়ুর্বেদ :
২২শে মাঘ, ১৩৭৪

ছড়ালো খুশির আলো
স্পর্শিল মৃত মন
লুকালো রুগ্ন পরিহাস
অতলান্তপ্রান্তিকে
—নতুন আলোর প্রতিভাস।

ভূতবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র*

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, পঞ্চতীর্থ

৫৫তম বার্ষিক আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ অধিবেশনে মনোবিজ্ঞান—ভূতবিদ্যা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ, ১৮ই মাঘ, ১৩৭৩

অতীত ভারতের সংস্কৃত শব্দ অসংখ্য। তাদের মধ্যে 'ভূত'ও একটি শব্দ। এই 'ভূত' শব্দকে নিয়ে শাব্দিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিকিৎসক, স্মার্ত, শিল্পী, পুরোহিত, বনজ দ্রব্যবিদ্, নৈয়ায়িক, তান্ত্রিক, সাধক প্রভৃতি ভারতীয় মনীষীবৃন্দ অসংখ্য গ্রন্থ নির্মাণ করেছেন। আজকের দিনে কোন পণ্ডিতই বলতে পারবেন না "ভূত" শব্দের এইটি নির্বাচিত অর্থ। কয়েকটি ক্ষেত্রের উদাহরণ দিয়ে আরব্ধ বিষয়ের অনুসরণ করবো :

(১) ভূত = ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম।

(২) ভূত = সত্য।

(৩) ভূত = জন্তু বা প্রাণী।

(৪) ভূত = ন্যায় বা যুক্তি।

"ছলং নিরস্যভূতেন ব্যবহারান্নয়েৎ নৃপঃ।
ভূতং অপাস্য পক্ষস্তং হীয়তে ব্যবহারতঃ॥"

—মিতাক্ষরা ব্যবহার অধ্যায়

(ভূতেন = ন্যায়েন)

অর্থাৎ যুক্তি বা ন্যায় দিয়ে ভুল বা ছলের বিবাদকে দূর করতে হয়। সাক্ষির কথাবার্তায় ছল দূর করতে হলে ভূত বা ন্যায় অথবা যুক্তির অনুসরণ করতে হয়।

(৫) ভূত = অতীত ঘটনা।

ভূতং ভূতং জিতং ভূয়া ইদানীং কিংতু কীর্তয়াম্

(বুদ্ধ কৌটিল্য)

ওহে, অতীতকে তো জয় করেছো, এখন কি বলতে চাও ?

(৬) ভূত = দেবযোনি বিশেষ।

ভূতাইমী দেবযোনয়ঃ (অমরকোষ)

ভূত—অর্থ দেবযোনির প্রাণী।

(৭) ভূত = অসুর গণ। ভূতাঃ অসুরগণা স্মৃতা

(কালিকা পুরাণ—২৯ অধ্যায়)

অর্থাৎ অসুর গণকে ভূত বলা হয়।

(৮) ভূত = পিশাচ বিশেষ অথবা রুদ্রের অনুচর।

(৯) ভূত = ব্রহ্মা, ভূত = বিষ্ণু, ভূত = মহেশ্বর।

(সহস্র নাম)

(১০) ভূত = লশুন (মেদিনী কোষ)

(১১) ভূত = ধাবানল (শব্দমালা)

(১২) ভূত = একটি বিশেষ তিথি (যেমন ভূত চতুর্দশী)।

এছাড়া ভূত শব্দের সঙ্গে ত্রাণ, ধাত্রী, নাথ, নায়িকা, নাশন, পত্নী, পুষ্প, পূর্ণিমা, ভাবন, ভৃৎ, মারী, যজ্ঞ, বাস, বিক্রতা, বৃধ, শুদ্ধি, হর, আবিষ্ট, অঙ্কুশ, আত্মা, অরি, আর্ত, পতি, কাম, আবেগ, কাম প্রভৃতি শব্দের যোগ করে ভূত শব্দের বহু অর্থ। ৭৮ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত মহাকবি অশ্বঘোষ তাঁর প্রখ্যাত মহাকাব্য "বুদ্ধ চরিত" গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে যেখানে বুদ্ধদেবের তপস্যা বর্ণনা করেছেন, সেইসময় 'মার' এসে তাঁর তপস্যায় নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করছে—সেই সময় বলেছেন—

ভূতং ততঃ কিঞ্চিদুপস্থ রূপং বিশিষ্ট ভূতং গগনস্থমেব।
দৃষ্ট্বর্ষয়ে ক্রুদ্ধমবৈর কৃষ্টং মারং বভাষে মহতা স্বরেণ।

অর্থাৎ তখন অদৃশ্য রূপ অবলম্বন ক'রে কোনও বিশিষ্ট প্রাণী আকাশ থেকে বজ্র কণ্ঠে হেঁকে সেই মারকে বল্লেন—হে মার! তুমি এই মুনির প্রতি এই দ্রোহ আচরণ করছো কেন?

আরও ঐ গ্রন্থের প্রথম সর্গে বুদ্ধের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করার সময় "ভূতৈরসোম্যৈঃ পরিত্যক্ত হিংসৈর্ণাকারি পীড়া স্বগণে পরে বা।" এই শিশু ক্রূর প্রাণী এবং স্বাভাবিক হিংস্র প্রাণীদের এবং আত্মীয় স্বজনের দুঃখ না দিয়ে সর্বদাই শান্ত ও সুখের পথ দেখাবেন।

মনুসংহিতা নামক একখানি প্রাচীন হিন্দুস্মৃতি-শাস্ত্রে এই ভূত শব্দ কয়েক বারই ব্যবহৃত হয়েছে—

"সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়ং উদ্ভবৌ"
"আসীদিদং তমোভূতম প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্"
তদা বিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মভিঃ
মনশ্চা বয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূত কৃদব্যয়ম্"

(মনু—১ম অধ্যায়)

এই ভাবে অন্যান্য গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখাতে গেলে এটা আর নিবন্ধ বা প্রবন্ধ হবে না, একখানা পুস্তক হয়ে যাবে। তাই নিরস্ত হলাম। এখন বক্তব্য এই যে ভূত শব্দের ব্যাপক অর্থ—আমাদের সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থগুলিতে ছড়াছড়ি। আয়ুর্বেদ-গ্রন্থগুলিতেও কম নয়। কিন্তু ভূত আর বিদ্যা এই দুইয়ে মিলে যেখানে "ভূতবিদ্যা", সেখানেও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-গ্রন্থে একটি কোন স্থির অর্থে সিদ্ধান্ত করা হয় নি। সবচেয়ে স্বল্প সুশ্রুত আর চরক নিয়ে। বাগ্‌ভটও এক্ষেত্রে চরককে ঠিক ঠিক অনুসরণ করেন নি।

প্রথম কথা—বিদ্যা। বিদ্ থেকে হয়েছে বিদ্যা। বিদ্ মানে জ্ঞান। বিদ্ মানে লাভ। বিদ্ মানে সত্তা। বিদ্ মানে বিচার। একমাত্র সত্তা বাচক বিদ্ ধাতুটি—অকর্মক, আর বাকী তিনটি অর্থেই সকর্মক। তা সকর্মক হোক্, আর অকর্মকই হোক্—বিদ্ ধাতুর অর্থ কোন সময়ই মানবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ছাড়া অন্য কোন উপায়ের জ্ঞান বিদ্ ধাতুর অভিপ্রেত হয় না। অতএব বিদ্ থেকে বিদ্যা হোলে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব জাগায় না। সেক্ষেত্রে ভূত-বিদ্যা কথাটিকে এমন ভাবে জানতে হবে যা ইন্দ্রিয়াতীত কোন জ্ঞানের বিষয় "ভূতবিদ্যা" এমন অর্থ চিকিৎসকরা গ্রহণ করতে পারেন না। অথচ ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা-বিদ্যার ক্ষেত্রে চরক সুশ্রুত বাগ্‌ভট তাঁদের গ্রন্থে এই ভূতবিদ্যাকে মানবের প্রয়োজনের বিষয় করেও ভূত-বিদ্যাটি যে চিকিৎসকেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য এমন তথ্যের নির্দেশের ক্ষেত্রেতিন জন চিকিৎসক-গুরু যে একমাত্র তা পাওয়া যায় না।

বাগ্‌ভট—ইনি বলেছেন আয়ুর্বেদ অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থখানি খুব সংক্ষিপ্ত নয়, আর খুব বিস্তৃতও নয়। এ গ্রন্থের অঙ্গ আটটি—তবে অগ্নিবেশ তন্ত্র (চরক প্রতিসংস্কৃত) গ্রন্থটির সারই বেশী থাকবে। তা ছাড়া আরও অন্যগ্রন্থের সারও থাকবে। সকলের আটটি অঙ্গই থাকবে।

"কায় বাল গ্রহোর্দ্ধাঙ্গ শল্য দ্রংষ্ট্রা জরা বৃষান্।
অষ্টা বঙ্গানি তস্যাহু শ্চিকিৎসা যেষু সংস্থিতা॥"

অর্থাৎ—কায়চিকিৎসা, বালচিকিৎসা, গ্রহ-চিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা, দ্রংষ্ট্রা-চিকিৎসা, রসায়ন-চিকিৎসা এবং বাজীকরণ-চিকিৎসা।

বাগ্‌ভটের গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ বলতে এই। এর মধ্যে যদি এই চিকিৎসাকে কেউ বলেন ঐটিই

ভূত-বিদ্যা তবে বলা যায় বাগভট তা বলেন নি। গ্রহ-চিকিৎসাটি উত্তরস্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন "বালগ্রহ-প্রতিষেধ অধ্যায়।"

তাতে বলেছেন পূর্বে মহাদেব পুত্র কার্তিকেয়ের রক্ষার জন্য মনুষ্য শরীরকে পাঁচটি গ্রহের রক্ষক বলে নির্মাণ করেন এবং স্ত্রীজাতির শরীরকে সাতটি গ্রহের আশ্রয়রূপে নির্মাণ করেন।

"পুরীগ্রহস্য রক্ষার্থং নির্মিতাঃ শূলপাণিনা।
মনুষ্যবিগ্রহা পঞ্চ: সপ্ত স্ত্রীবিগ্রহা গ্রহাঃ।"

এ প্রসঙ্গ নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। এমন এক কল্পিত কাহিনীর বিষয় যে মানুষের দেহ নয়, সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা নিরর্থক।

তারপর সেই উত্তরস্থানেরই চতুর্থ অধ্যায়ে আরম্ভ করেছেন "ভূতবিজ্ঞান অধ্যায়"। বাগ্‌ভট বলেছেন—এ প্রসঙ্গটি পূর্বে আত্রেয় প্রভৃতি মহর্ষিরা বলেছেন। আত্রেয় মহর্ষি বলেন এক চরকসংহিতা গ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও প্রামাণ্য গ্রন্থের সন্ধান আমরা পাই না। যদি বলা যায়—এই ভূতবিজ্ঞান অধ্যায়টিই বাগ্‌ভটের ভূতবিদ্যা—তা হলে তাঁর "অষ্টাঙ্গ" কথাটির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য থাকে না। অষ্টাঙ্গের মধ্যে ভূতবিদ্যা নাই। বাগ্‌ভট বলেছেন—মানবের মধ্যে যদি অমানষ চেষ্টা দেখা যায়, তবে তাকে ভূতগ্রহ বলবে। "পুরুষেঽপৌরুষঃ যত্র তত্র ভূতগ্রহঃ বদেৎ"—তাহলে প্রশ্ন ওঠে পৌরুষ জ্ঞান কি?

উত্তর দিয়েছেন—"লক্ষণং জ্ঞান বিজ্ঞান বাক্ চেষ্টা বল পৌরুষম্"—এইগুলি পৌরুষ বিজ্ঞান। অন্য কিছু অপৌরুষ জ্ঞান; অথচ যতগুলি অপৌরুষ জ্ঞানের লক্ষণ সবই কিন্তু প্রবল বায়ুজন্য মনোবাহী শিরা, মনোবাহী স্রোতের বিকার বলে বর্ণনা করেছেন ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

এতে হয়েছে এই যে, অল্পজ্ঞানী চিকিৎসক ধাঁধায় পড়েন। আসলে চতুর্থ পঞ্চম অধ্যায়দুটি কারও দ্বারা সংযোজিত পরে—এটা নিশ্চিত। কারণ, গ্রহের ব্যাপারটি যেমন কাল্পনিক ও অবৈজ্ঞানিক, তেমনি ভূতবিজ্ঞানের অধ্যায় দুটিও একটি সম্প্রদায়ের দ্বারা সংযোজিত। সে-সম্প্রদায় একশ্রেণীর পুরোহিত। পুরোহিত সম্প্রদায় বৈদ্যসম্প্রদায় অপেক্ষা প্রামাণ্য ছিলেন এবং তারাই ভূতবিদ্যা এবং ভূতাপসরণ জানতেন, এমন প্রমাণ সুশ্রুতির প্রসঙ্গে তুলে দিচ্ছি। এই পুরোহিত সম্প্রদায় অথর্ব-সম্প্রদায়; অর্থাৎ অথর্ববেদ বলে খ্যাত। মহাকবি কালিদাস বশিষ্ঠকে অথর্ববেদবিদ্ এবং পুরোহিত এবং মন্ত্রতন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন রঘুবংশ মহাকাব্যের দিলীপের গুরু আশ্রমে যাত্রার প্রসঙ্গে।

তবে বাগ্‌ভটের লেখা বলে অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উত্তর স্থানে চতুর্থ—পঞ্চম অধ্যায়দুটি প্রতিপন্ন করলেও লক্ষিত হয় একটি কথা, যেটি চরকের অভিমত। বাগভট বলেছেন—অমানুষীয় কিংবা অপৌরুষের চেষ্টাকে ভূতবিজ্ঞান বলে আখ্যাত করলেও সেই পুরুষের জ্ঞানকে অপৌরুষের জ্ঞান বলা যায় না। কারণ—

"হেতুস্তদনুবন্ধো হি সদ্য পূর্ব্ব কৃতোঽথবা।
প্রজ্ঞাপরাধঃ সুতরাং তেন কামাদি জন্মনা।"

অর্থাৎ—যদিও ভূতবিজ্ঞানটি অপৌরুষের বলে প্রচলিত তাহলেও চিকিৎসক মনে করেন এটা মানুষের "প্রজ্ঞাপরাধ" দোষের জন্য ঘটে। প্রজ্ঞাপরাধ ঘটে ইহজীবনে প্রবল কামাদি রিপুর তাড়নায়, কিংবা সদ্য সদ্য কৃতকর্মের প্রবল শক্তিতে, কিংবা পূর্বজন্মের প্রবল কর্মের ফলে। অতএব চিকিৎসক

অপৌরুষের চেষ্টা দেখলে তিনি জপ-হোমাদি করবেন —মন্ত্র এবং পূজারও আশ্রয় নেবেন এবং তার সঙ্গে ব্যাধি-চিকিৎসা-বিধিও প্রয়োগ করবেন। সে চিকিৎসা উন্মাদ বা এবপ্রকার রোগের চিত্তবিপ্লব-ঘটিত বলে মনে করবেন।

সর্বব্যাধিং চিকিৎসং তং জপন্ সর্ব্বগ্রহান্ জয়েৎ।
তথোন্মাদানে পঞ্চারানন্তং বা চিত্তবিপ্লবম্॥

অতএব মনে করা চলে ভূতবিদ্যা সম্বন্ধে বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়ের মধ্যে ওটি কোন অঙ্গও নয় এবং ভূতবিদ্যাটি অপৌরুষের বিজ্ঞানও নয় এবং তার চিকিৎসাও অপৌরুষের নয়। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অর্থাৎ অতিসন্ধায় বিশ্বাসী বৌদ্ধ বজ্রযান মার্গের মূর্তি তন্ত্রবাদ প্রচারক পুরোহিত সম্প্রদায়ের দ্বারা সংরক্ষিত অধ্যায় এবং অথর্ব পুরোহিত সম্প্রদায়েরও। এবার সুশ্রুতের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভূতবিদ্যার ব্যাপক অর্থ আমরা পূর্বেই করেছি, সেগুলির মতে চিকিৎসক কোথাও অতীন্দ্রিয় অর্থে ভূত শব্দকে গ্রহণ করেন নি। সুশ্রুতের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বাগ্‌ভটের পরিভাষায় নয়—তাঁর পরিভাষায় ভূতবিদ্যাও আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গের মধ্যে একটি প্রধান অঙ্গ।

সুশ্রুত বলেছেন—নরাণাং অন্তায়ুষত্ব-মেধাত্বক অবলোক্য ভূরোহিতৈষী প্রণীতবান-স্বয়ম্ভুঃ। তদ্ যথা, শল্যং শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যং অগদতন্ত্রং রসায়নতন্ত্রং বাজীকরণতন্ত্রমিতি।

এর মধ্যে চতুর্থী বিদ্যা "ভূতবিদ্যা"—সে-বিদ্যাটি জপ হোম শান্তি কর্ম বলিদান প্রভৃতি গ্রহোপশমন।

(সূত্রস্থান-১ অঃ)

ভাল কথা। তা হলে কিসের জন্য এই বিদ্যা শিখতে হয়? উত্তর দিয়েছেন—

মানবকে এরা গ্রহণ করে—তাই তারা গ্রহ বলে আখ্যাত হয়। কে তারা?

সুশ্রুত বলেছেন, দেব-অসুর-গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষ-পিতৃগণ পিশাচ-নাগ প্রভৃতি। ডহণ টীকায় বলেছেন—গন্ধর্ব মানে দেবগায়ক এবং রাক্ষস মানে রাবণ প্রভৃতি।

এই ভূতবিদ্যা সম্বন্ধে সুশ্রুতের সিদ্ধান্তে খুব জটিলতা উপস্থিত হয়। সেই জন্য সুশ্রুত একটি প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন, মানবের মৃত্যুর সংখ্যা কত? সে সংখ্যা এক শত এক প্রকার। প্রকৃত মৃত্যু এক প্রকার, বাকী এক শত প্রকার মৃত্যুর নাম অপমৃত্যু। কালমৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু। তার পরিমাণ এক শত বৎসর বাঁচার পরে ঘটে। তার এদিকে মৃত্যু হলে সে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কিন্তু কোন গ্রহের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে ব্যাধিও হয়, মৃত্যুও হয়। সেই এক শত প্রকার মৃত্যু ঘটায় গ্রহগণ। যে গ্রহগুলির নাম পূর্বেই বলেছি। এই গ্রহজনিত মৃত্যুকে আগন্তুক মৃত্যু বলে। এই আগন্তুক মৃত্যু বেশী হয় মানবের। সেই জন্য সাধারণ মানব অপেক্ষা অসাধারণ মানবের জীবন রক্ষা সর্বাগ্রে রাজারই কর্তব্য। সুশ্রুত বলেছেন—এটা আমার মত নয়—এটি অথর্ব-বেদের মত।

"এতোত্তরং মৃত্যুশতং অথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কাল সংযুক্তঃ শেষাঃ আগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥

(সুশ্রুত-সূত্র-৩৪ অঃ)

এই অথর্ববেদের মতে বৈদ্য অপেক্ষা পুরোহিতের মূল্য বেশী। কারণ ব্রহ্মা আয়ুর্বেদকে নির্মাণ করেছিলেন। সে আয়ুর্বেদ অষ্টাঙ্গযুক্ত।

সেই অষ্টাঙ্গ আবার বেদাঙ্গযুক্ত। পুরোহিত অধ্যয়ন করেন বেদাঙ্গসহিত বেদ। আর বৈদ্য অধ্যয়ন করেন মাত্র বেদাঙ্গ। অতএব বৈদ্যকে পুরোহিতের মতে আস্থা স্থাপন করতেই হবে। পুরোহিতই ভূতবিদ্যা জানেন।

ব্রহ্মা বেদাঙ্গ মষ্টাঙ্গং আয়ুর্বেদং মতাবহঃ।
পুরোহিতমতে তস্মাৎ বর্ত্ততে ভিষগাত্মবান্॥
(সুশ্রুত-সূত্রস্থান-২৪ অধ্যায়)

যারা হিংসা আদি ক্রূর কার্য করে, যারা দেব-ভাবের আবেশে থেকে মানবের দেহে প্রবেশ করে তারা গ্রহ, তারা ভূত। এদের স্বরূপ এদের কার্য যারা জানেন তারা পুরোহিত, আর তাঁদের এ বিদ্যা ভূতবিদ্যা। এই বিদ্যাটি বৈদ্যও শিখতে পারেন পুরোহিতের আনুগত্য করে।

হিংসা বিহারা যে কেচিৎ দেব ভাব মুপাশ্রিতাঃ।
ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবক্ষ্যতি:।
গ্রহসংজ্ঞানি ভূতানি যস্মাৎবেত্তানহঃ ভিষক্।
বিদ্যয়া ভূতবিদ্যাবৎ অতএব নিরুচ্যতে॥
(সুশ্রুত-উত্তরতন্ত্র-৬০ অঃ)

সুশ্রুত সংহিতার আটটি অঙ্গ অধ্যয়ন করলে স্পষ্টই বোঝা যায় এ সংহিতার সব কয়টি অঙ্গই সুশ্রুতের প্রতিজ্ঞাত চিকিৎসাশাস্ত্রের বিষয় নয়। কারণ অরচিকিৎসার মত একটি বিশেষ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও অর্থাৎ একমাত্র অরচিকিৎসা ভাল করে জানলে যখন প্রায় সমস্ত কায়চিকিৎসার ক্ষেত্রগুলি স্পষ্ট হয়ে যায়—সে ক্ষেত্রেও সুশ্রুত ভূতবিদ্যার চিকিৎসাকে ঠাঁই দিয়েছেন। অর্থাৎ অথর্ববেদের পৌরোহিত্য বিদ্যাকে এক বিশেষ চিকিৎসাতন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন। সেখানে মনে হয়, সুশ্রুতের প্রথম দিকটি অর্থাৎ শল্য শালাক্য এবং কায়চিকিৎসার বিষয়গুলি সৌশ্রুতী বিদ্যা, বাকী অথর্ববেদ বিদ্যা। রসায়ন, বাজীকরণ কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র এবং ভূতবিদ্যা এগুলি অথর্ববেদীয় বিদ্যারই সারাংশ আর তার চিকিৎসার মধ্যেও স্থানে স্থানে ভূতবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে সুশ্রুত উপদেশ দিয়েছেন। অপরপক্ষে বলা যায়, ভূতবিদ্যার নিরুক্তি, লক্ষণ, সূত্র এবং চিকিৎসার অঙ্গগুলি যখন পুরোহিতের আয়ত্তাধীন এবং বৈদ্যের গৌণত্ব, সেখানে ভূতবিদ্যাটি সৌশ্রুতী বিদ্যাই নয়—মানবীয় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করাই যায় না। কৌমারভৃত্য এবং অগদতন্ত্র বিদ্যাও সৌশ্রুতী বিদ্যা নয়।

এই ভূতবিদ্যা সম্বন্ধে চরকের অভিমত কি সেটিও অবশ্য জ্ঞাতব্য।

অগ্নিবেশ তন্ত্র নামে প্রাচীন একখানি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের চরকীয় সংস্করণ ছাড়া আত্রেয় সংহিতা বা অগ্নিবেশতন্ত্র বলে কোন গ্রন্থ আমরা পাই না। একথা আয়ুর্বেদিক পণ্ডিতগণ ভালই জানেন।

সেই চরকগ্রন্থের প্রথমেই ভূত শব্দটি কোন গ্রহ-বিশেষকে লক্ষ্য করে উল্লিখিত হয়নি—মুখ্যত মানবকেই ভূত বলেছেন—যেমন,

তদা ভূতেষনুক্রোশঃ পুরকৃতা মহর্ষয়ঃ॥
সমেতা পুণ্যকর্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে॥

অর্থাৎ মানবের রোগকষ্ট দেখে মহর্ষিবৃন্দের দুঃখ হয়, তার নিবারণের উপায় জানতে অন্যান্য মহর্ষিরা হিমালয়ের পার্শ্বে এসে উপনীত হন। এখানে ভূত মানে মানব।

এমনি ভাবে কয়েকবারই ভূত মানে যে মানব তা বলা হয়েছে—যেমন,

শিষ্যেভ্যো দত্তবান্ যড়ভ্যঃ সর্ব্বভূতানুকম্পয়া।
(চঃ-সূ-১ম অধ্যায়)

সর্ব্বভূতেষনুক্রোশ ইত্যুক্তেঽনুমেনিরে॥
ভবায় ভূতসংঘানাং প্রতিষ্ঠাং ভুবি লেভিরে।

প্রকৃতিস্থেষু কৃতেষু বৈদ্যবৃত্তি শ্চতুর্বিধা।

অথ ভূতদয়াং প্রতি ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন এই যে চরক কি ভূতবিদ্যা বলে আয়ুর্বেদের একটি অঙ্গকে মানতেন না?

হাঁ, মানতেন—তবে তাঁর অভিমত নয়—সেটি অথর্ববেদিক আয়ুর্বেদের অভিমত।

সেই জন্যই চরকের সূত্রস্থানের ১১ অধ্যায়ে বলেছেন—

"ত্রয়ো রোগা ইতি নিজাগন্তুমানসা।" অর্থাৎ রোগ তিনপ্রকার, নিজ রোগ, আগন্তুক রোগ এবং মানস রোগ। আগন্তু রোগ মানে ভূত, বায়ু, অগ্নি সন্প্রহার ইত্যাদি কারণে।

আর চিকিৎসা দুই প্রকার—দৈবও যুক্তি-আশ্রিত। দৈবচিকিৎসা মানে মন্ত্র-ওষধি-মণি-মাঙ্গল্য-জপ-হোম ইত্যাদি।

এই সব দেখে অল্পবুদ্ধি চিকিৎসক ঘাবড়ে যান। তাঁরা মনে করেন, তা হলে সুশ্রুত আর চরকের মত অভিন্ন হবে না কেন? না, তাতেও অভিন্ন নয়।

এই চরকই সূত্রস্থানের ৩০ অধ্যায়ে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সেখানে প্রথমে বলেছেন আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ—"তাসচিকিৎসা আদ্যাকং শল্যতন্ত্রকং বিষগর বৈরোধিক প্রশমনং ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্যকং রসায়নানি বাজীকরণং চ"

কিন্তু এটি আমার এ গ্রন্থের বক্তব্য নয়। আমার গ্রন্থের বক্তব্য আটটি ঠিকই তবে সেগুলি পূর্বের আটটি নয়। ও গুলি অথর্ববেদ অন্তর্গত আয়ুর্বেদের, আর আমার এ গ্রন্থ আয়ুর্বেদের অন্তর্গত তন্ত্রগ্রন্থ। তন্ত্র সংজ্ঞাটি আয়ুর্বেদেরই। আয়ুর্বেদের শাখা "বিদ্যা সূত্রং জ্ঞানং শাস্ত্রং লক্ষণং তন্ত্রং ইতি অনর্থান্তরম্।" অর্থাৎ আয়ুর্বেদেরই অন্য নাম শাখা তন্ত্র ইত্যাদি।

সেইজন্য আয়ুর্বেদ বা এই তন্ত্রের অঙ্গ আটটি পৃথক্। অঙ্গ বা স্থানও একই পরিভাষা।

এই তন্ত্রের আটটি অঙ্গ হোলো 'সূত্র নিদান বিমান শারীর ইন্দ্রিয় চিকিৎসিত কল্প সিদ্ধি স্থানানি।'

চরকের এই স্পষ্ট অভিমত জেনেও কি কেউ বলতে পারেন ভূতবিদ্যাটি চরকসংহিতার একটি অঙ্গ।

সেই জন্যই চরক "ভূতোন্মাদ ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ভাষায় ও দৃঢ়কণ্ঠে জ্ঞাপন করেছেন যে, ভূত-বিদ্যা যাঁরা মানেন তাঁরা মানুন, আমি মানি না। যাঁরা মানেন তাঁরা অথর্ববেদ অন্তর্গত আয়ুর্বেদকে মানেন, আর আমি বিজ্ঞানসম্মত আয়ুর্বেদ তন্ত্রকে মানি। কারণ, ভূতোন্মাদের ব্যাখ্যায় আথর্বিক আয়ুর্বেদবিদ্‌গণ বলেন, গ্রহ গন্ধর্ব পিশাচ রাক্ষস প্রভৃতি অমানুষগণ ঐ রোগ সৃষ্টি করেন, আর আমি বলি, তা সম্ভব বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা তা করুন—আমার অভিমত স্বতন্ত্র—'নৈব দেবা ন গন্ধর্ব্বা ন পিশাচান রাক্ষসাঃ।'

ন চান্যে স্বয়মক্লিষ্টমুপক্লিশ্নন্তি মানবম্।
যেষেনমনুবর্ত্তন্তে ক্লিশ্যমানং স্বকর্মণা॥
ন তন্নিমিত্তঃ ক্লেশোঽস্মৌ নন্তক্তিকৃতকৃত্যতা।
প্রজ্ঞাপরাধাৎ সম্প্রাপ্তে ব্যাধৌ কর্ম্মজ আত্মনঃ।
নাভিশংসেদ্‌বুধোদেবান্ ন পিতৃন্ নাপি রাক্ষসান্
আত্মানমেব মন্যেত কর্ত্তারং সুখ দুঃখয়োঃ।
তস্মাৎ শ্রেয়স্করং মার্গং প্রতিপদ্যেত ন ভ্রংশেৎ।
দেবাদীনামপচিতিহিতানামুপসেবনম্।
ন চ তেভ্যো বিরোধশ্চ সর্ব্বমায়ত্ত মাত্মনি।

অর্থাৎ মানুষ নিজের দোষে নিজে ক্লিষ্ট না হলে দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস বা অপর কেউ কাউকে কষ্ট দেয় না—দিতে পারে না। মানুষ যখন নিজের বুদ্ধির দোষে কষ্ট পায়, নিজের বুদ্ধির গুণে সুখ পায় দেবতারা তার অনুসরণ করেন ; অর্থাৎ মানুষের দুঃখে দুঃখী হয়ে তাদের দুঃখ দূর করেন, সুখে সুখী হয়ে আরও সুখ বিধান করেন। এ না হলে কিছুরই কৃতজ্ঞতা থাকেনা। কর্মশক্তি ও কর্মফলের অস্তিত্বই থাকে না। কর্মই কর্মবুদ্ধি করে, তা সে শুভ বা অশুভই হোক। দেবতারা নিষ্কর্মা নন। মানুষ বুদ্ধির দোষে আত্মকৃত কর্মে ক্লিষ্ট হয়, ব্যাধিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে দেবতা রাক্ষসকে দোষ দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? আত্মকর্মকেই তো সুখ দুঃখের কারণ ভাবা উচিত। অতএব কোন সময়েই বিচলিত হবে না—পূজনীয়দের অবমাননা করবে কেন? আর কর্মহীন হয়ে তাঁদের মত কর্মঠদের কাছে কি চাও? তাঁরা চঞ্চল নন। তাঁরা বিরোধ করা, হিংসা করা স্বভাব থেকে পরিমুক্ত সর্বদা। তোমার কর্মই তোমার আয়ত্তাধীন। মঙ্গলময় কার্য থেকে কখনও ভ্রষ্ট হবে না।

অতএব পরিষ্কার জানা গেল ভূতবিদ্যা নামে একটি বিদ্যার অস্তিত্ব সুশ্রুত চরক জানতেন। সুশ্রুত জানিয়েছেন সেটি অথর্ববেদিক আয়ুর্বেদীয় জ্ঞান-সম্পন্ন পুরোহিতদের। আর চরক বলেছেন, চিকিৎসক এবং সাধারণ মানুষের জানা উচিত নিজের কর্মফলের ঊর্দ্ধে যদি কিছুর অস্তিত্ব থাকে থাকুক, তাতে আমাদের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু প্রয়োজন আমাদের নিজের কর্মে ও কর্মফলে।

এ উপদেশ চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের প্রতি :—বর্তমান জগতের মানব সাধারণের কাছে চরকের এই সত্যনির্ঘোষ বাণী যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য, তেমনি ব্যবহারগত সত্য। চিকিৎসক হবেন অতীন্দ্রিয়বাদে শ্রদ্ধাবান এবং নিজের ব্যবহারগত কর্মময় জীবনে হবেন পূর্ণ আস্থাশীল।

এ উপদেশ যাঁরা গ্রহণ করবেন, অগ্নিবেশ তাঁদের জন্য আশীর্বাণীর সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

দীর্ঘায়ুষঃ প্রজা নীরোগা ঋদ্ধিঃ পুষ্কলম্।
হিতার্থং প্রাণিনাং প্রোক্তং অগ্নিবেশেন ধীমতা।
নিশ্চিকাদুত্তমাং লোকে প্রাপ্নোতি বিধিনা পঠন্॥
চরক-সিঃ-১২ অধ্যায়-৭২ শ্লোঃ

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

পঞ্চত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশন, কলিকাতা, ১৩৭৩

অনুষ্ঠান-সূচী

উদ্বোধন-উৎসব

স্থান—আশুতোষ হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রবিবার, ১৫ই মাঘ, ১৩৭৩ (২৯শে জানুয়ারি, ১৯৬৭, বেলা ৪টা

কার্যক্রম :

১। মঙ্গলাচরণ ও সাধারণ
২। স্বাগত সম্ভাষণ—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার বসুমদার, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ
৩। উদ্বোধন—স্বামী রঙ্গনাথানন্দ
৪। প্রধান অতিথি—অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
৫। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতা

৬। সভাপতির অভিভাষণ—কবিরাজ
শ্রীরবীন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, এম-এ, এম-বি,

৭। ধন্যবাদ—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ
চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক।

নবম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৭৩
স্থান—যাদবপুর হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রবিবার, ২২শে মাঘ, ১৩৭৩ (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭), বেলা ৯টা)

কার্যসূচী :

১। মঙ্গলাচরণ ও বাণীদান
২। সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন—প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ
৩। ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা—অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বসু, ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীঅজিত দত্ত, ডঃ শ্রীসাধন কুমার ভট্টাচার্য, ডঃ শ্রীবিশ্বপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, ডঃ শ্রীরমেন্দ্র নাথ সেন, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীদুর্গাশরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভাদাচার্য, শ্রীঅবনীলাল মৈত্র, ডঃ শ্রীকল্যাণ কুমার গাঙ্গুলী, কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, ডাঃ শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ রায়, ডঃ শ্রীগোপালদাস রায় চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীকিতীশ চন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি।
সভাপতির অভিভাষণ—ডঃ শ্রীসুকুমার সেন।
বিভাগীয় সভা, আলোচনা, জনপ্রিয় বক্তৃতা ও ঔষধ প্রদর্শন

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৭৩ (৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬৭)

১। কায়চিকিৎসা বিভাগ—বেলা ২টা
সভাপতি—অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক
প্রবন্ধ পাঠ :
বাতব্যাধি চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীযাদব লাল ব্রহ্মচারী, বৈদ্যশাস্ত্রী
নাড়ীবিজ্ঞান—কবিরাজ শ্রীকণিভূষণ রায়, এস্-এ-এম্-এস্, ভিষগ্‌রত্ন
শিশু চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীরবীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী
ব্লাডপ্রেসার—কবিরাজ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, এম-এ
তদ্‌বিষয়ক বক্তব্য : বহুযোগ—
সূচনা—অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, এম-এ, স্মৃতিতীর্থ।

২। জনস্বাস্থ্য—দ্রব্যবিজ্ঞান বিভাগ বেলা ৩॥০
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীঅমলনারায়ণ সেন, বৈদ্যশাস্ত্রী
প্রবন্ধ পাঠ :
ওষুধে খাদ্যের প্রয়োগ—কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন, সাহিত্য-ভারতী
ঔষধ প্রদর্শন ও গুণাগুণ বিচার—কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা
জনপ্রিয় বক্তৃতা : যুগধর্ম ও সমাজবোধ—
অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, এম-এ।

মঙ্গলবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৭৩ (৩১শে জানুয়ারি, ১৯৬৭)

স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
৩। রসায়ন—বাজীকরণ বিভাগ বেলা ২টা
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীগুরুপদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বৈদ্যশাস্ত্রী
প্রবন্ধ পাঠ :
রসায়নের প্রয়োজনীয়তা—কবিরাজ শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ-এস্-এফ্, আয়ুর্বেদতীর্থ
বাজীকরণ—কবিরাজ শ্রীদামোদর শাস্ত্রী
তদ্‌বিষয়ক বক্তব্য : আয়ুর্বেদে অর্শরোগ (ক্যান্সার) নিদান ও চিকিৎসাবিধি
সূচনা—কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি।

৪। শারীরক্রিয়া-বিজ্ঞান বিভাগ বেলা ৩॥০

সভাপতি—কবিরাজ শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র নাগ, এস্-এ-এম্-এস্, ভিষগ্‌রত্ন
রোগনির্ণয়ে জিহ্বোষ ও জীবাণুতত্ত্ব—
কবিরাজ শ্রীঅনন্তকুমার সেনশর্মা
ধাতুরসের দেহে বিকৃতি—কবিরাজ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ আচার্য, সাংখ্যতীর্থ
আলোচনা : চরকের 'বিবিধাশিতপীতীয়ঃ'—
কবিরাজ শ্রীমুরারিমোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ
জনপ্রিয় বক্তৃতা : সংক্রামক ব্যাধি দমনে ও
জনস্বাস্থ্যরক্ষায় আয়ুর্বেদ—কবিরাজ
শ্রীমঙ্গলাচরণ সেন, বৈদ্যাচার্য।

বুধবার, ১৮ই মাঘ, ১৩৭৩ (১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭)
স্থান—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

৫। মনোবিজ্ঞান—ভূতবিদ্যা বিভাগ　　বেলা ২টা
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঠাকুর পঞ্চতীর্থ
অবতারণা—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্করসেন শাস্ত্রী
প্রবন্ধ পাঠ :
আয়ুর্বেদে মনস্তত্ত্ব—অধ্যাপক পণ্ডিত
শ্রীঅতীন্দ্র নাথ ন্যায়াচার্য
মনের চিকিৎসা—কবিরাজ
শ্রীসুধাকান্ত সেন, এস্-এ-এম্-এস্, ভিষগ্‌রত্ন
নিদ্রা ও মনের প্রভাব—পণ্ডিত
শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়।
দেহিনাং : উন্মাদ রোগ
সূচনা—কবিরাজ শ্রীঅতুলবিহারী দত্ত, বি-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী।

৬। শল্য বিভাগ—　　বেলা—৩টা
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীপ্রভাত চন্দ্র সেন, ভিষগ্‌শাস্ত্রী
প্রধান বক্তা—কবিরাজ
শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত, এস্-এ-এম্-এস্ ভিষগ্‌রত্ন—আয়ুর্বেদে অস্ত্র প্রয়োগ ও ভেষজবিধি
প্রবন্ধ পাঠ :
শল্যচিকিৎসা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান—কবিরাজ
শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, এস্-এ-এম্-এস্, ভিষগ্‌রত্ন

৭। প্যারাডা—অগদতন্ত্র বিভাগ　　বেলা—৪টা
সভাপতি—কবিরাজ শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন, এম-বি
প্রবন্ধ পাঠ :
অগদতন্ত্র—কবিরাজ শ্রীগোবর্ধন শর্মা
কর্ণরোগ—কবিরাজ
শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী
চক্ষুরোগ—কবিরাজ শ্রীলালমোহন প্রসাদ শর্মা
বিষচিকিৎসা—কবিরাজ
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বৈদ্যশাস্ত্রী
জনপ্রিয় বক্তৃতা : সংযম ও আধুনিকতা—
ডঃ শ্রীরমেন্দ্র নাথ সেন
পর্য্যালোচনা—কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী।

নিবেদন

এবারের বার্ষিক অধিবেশনে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাহারা এই সব বিষয়ে বলিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তাহারা, আশা করি, তাহাদের বক্তব্যবিষয়গুলি লিখিয়া আনিবেন। তাহা হইলে 'আয়ুর্বেদ-ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। আপনাদের সকলের ও অন্যান্য কবিরাজ ও সাধারণের সহযোগিতা কামনা করি। ইতি—৫ই মাঘ, ১৩৭৩

ঠিকানা :
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ,
৫০১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

কবিরাজ বঙ্গলা কুমার মজুমদার
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

৩৫তম বার্ষিক অধিবেশন, কলিকাতা, ১৩৭৩

উদ্বোধন-উৎসব—ধারভাঙ্গা হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতির বিবৃতি

বন্ধুগণ,

আপনাদের সকলকে আজ আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইতেছি।

দেখিতে দেখিতে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ পঁয়ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশে বিদেশে নানা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিচিত্র উৎকর্ষ ও অবনতি রেখাপাত করিয়াছে—কত উত্থান-পতন জাতি ও সমাজে—কত সংঘর্ষ জাতিতে জাতিতে, আবার মিলনের দানছত্র কতরূপ অভাবে স্বভাবে দানা বাঁধিয়াছে। শিল্পায়নের জগৎজোড়া বিস্তৃতি—সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তনের বিবিধ প্রকাশ দেশ ও সমাজের মনশ্চিত্র কখনও উজ্জ্বল, কখনও বিপ্রভ করিয়াছে। প্রতিপদেই নতুনের লীলা—পুরাতনের সরল আনন্দ ও বিরানন্দের দোলায় মানবগোষ্ঠীকে অস্থির জীবনের সৃষ্টির প্রতিভাষ প্রভাবিত করিয়াছে। দেশের যাহারা ধারক ও বাহক, শাসক ও পরিচালক, শাস্ত্রক ও গবেষক তাহারা কি পুরাতনের গবেষণা ও নতুনের অনুসন্ধান করিয়াছেন, না পরমুখাপেক্ষিতার দাসত্বে ক্ষতস্ফীত ও সহজ অনুকরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় কালাতিপাত করিয়াছেন? আজ আত্মসমীক্ষার সময় আসিয়াছে।

জীবনে জীবনে দেশে দেশে মিল থাকিলেও অমিলের প্রাচীর কাহাকেও গণ্ডীভূত করিয়া রাখিতে পারে নাই—তাহা হইলেও প্রত্যেক দেশের জীবন-দর্শনের বৈশিষ্ট্য আছে। তাহার ফলে আচার-ব্যবহার, নীতিনির্দেশ পৃথক—বিজ্ঞানের নীতি ও প্রত্যক্ষ প্রয়োগে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেহের সহিত যেমন মনের—মনের সহিত তেমন আত্মার। আত্মার দেহ ও মন উভয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকায় বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সমারোহ চলিয়াছে। সুতরাং যখনই কোন রোগের চিকিৎসার প্রশ্ন আসে, তখন মনেরও অবস্থা অগ্রাহ্য করা যায় না, কারণ মন কিছুটা আত্মারই প্রতিচ্ছবি। খাদ্যের বাদ-বিচারও সেই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত, তাহা ত্রিগুণের ত্রিধারা বা মিশ্রধারা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে—যেখানে বিযুক্তি সেখানে বিশৃঙ্খলা। শুধু দেহে নয়, মনেও।

একই চিকিৎসাবিজ্ঞান বহুরূপে বিভিন্ন দেশে প্রকৃতিগত ও বিকৃতিগত বিকারে রোগারোগ্যের নিয়ামক হয়। নীতি বাদ দিলেও দেশকাল-পাত্রভেদে যে বিভিন্নতা অনুসরণ করিতে হয়, তাহা শুধু বাহ্যিক পার্থক্যের নিরীখে বিশ্লেষণ করা যায় না, দৈহিক ও মানসিক গঠনের মৌলিক ভিন্নতার আন্তরিক ক্রিয়া-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত হইলে সফলতা লাভ করিতে পারে। বিভিন্ন প্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির যে বিচিত্রতা—দেশের আবহাওয়া অনুপাতে যে দৈহিক গঠন, সহ্যশক্তি ও রোগবিশেষের প্রাদুর্ভাব মানব শিশুর

জন্ম ও প্রতিপালনের মধ্যে প্রতিফলিত ও ক্রিয়াশীল থাকে, তাহার নীতি ও দর্শন চিকিৎসাক্ষেত্রেও বিশুদ্ধতা ও বৈপরীত্য আনে, বিশেষত আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমির নিরীখে। ভারতের সত্তাদ্রষ্টা ঋষিপ্রণীত হওয়ায় উহার নীতি, ব্যবহার, আদর্শ, দর্শন ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানধারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অনুসৃত পথে গোটা মানুষের সর্বাঙ্গীন চিকিৎসার বৈভবশ্রী উদ্ভাসিত করিয়াছে। আধুনিক বা পুরাতন বলিয়া কোন নীতি বা বস্তুকে শ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করা যায় না—সত্য, শ্রেয় যেখানে আছে, সেখানেই সৃষ্টি ও শান্তির ধারা প্রবাহিত হয়। পরিবর্তন জগতের ধর্ম কিন্তু মৌলিক নীতি বদলায় না যেমন প্রকৃতির নীতি—সেখানে তাহার আপাত পরিবর্তন মনে হয় মানুষের অজ্ঞতাপ্রসূত। অবশ্য রাজনীতির দাবাখেলায় লীলায়িত হয় একটা প্রচ্ছন্ন কূটবুদ্ধিজাল যাহা প্রযুক্ত হয় ক্ষমতা, অর্থ ও পদমর্যাদা রক্ষায়—সেখানে বুদ্ধির খেলার পরিবর্তন হয় প্রতিনিয়ত। আয়ুর্বেদের নীতি কালজয়ী—উহা বিজ্ঞানে যেমন ফলপ্রসূ, সমাজেও তেমন প্রযুক্ত ও সত্যের সন্ধান দেয়, এমন কি, আধ্যাত্মিক জগতেও তাহার ব্যবহার সুখ ও শান্তি বিধান করে। বাস্তবধর্মী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে লেনদেন বিচার করে, মানবধর্মী সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বিচার করে আর অধ্যাত্মধর্মী নির্লিপ্তভাবে নিঃস্বার্থ কামনাহীন সাত্ত্বিক প্রকাশে বিদ্যমান—একটি ক্ষণিক, অন্য দুইটি ক্রমাবয় স্থায়ী ও শাশ্বত—একটি আমিকে কেন্দ্র করিয়া (subjective), অন্য দুইটি ক্রমাবয় অনুকেন্দ্রিক, (objective) ও শাশ্বত কল্যাণের মূর্তি। এই ভিত্তি ও নীতি ও ঐতিহ্য আয়ুর্বেদের সর্বত্র পথনির্দেশ করিয়াছে। বস্তুত জীবনকে স্বকীয় পরকীয় ও শাশ্বত এই তিন দিক হইতে অনুসন্ধান করা দরকার একটি স্থির নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেহে সমভাব সৃষ্টি করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য—একটি নিরাময় করিতে গিয়া অন্য রোগ সৃষ্টি করা সুচিকিৎসার পরিপন্থী ও যন্ত্রণার কারণ। ত্রিদোষতত্ত্ব সেই সামগ্রিক দৈহিক নীতিরই সন্ধান। সপ্তধাতুর প্রকৃতি ত্রিদোষের সমতা ও অসমতার উপর নির্ভর করে যেমন রোগ নির্ণয়ে তেমন রোগ চিকিৎসা, দ্রব্য, প্রকৃতি ও ঔষধ প্রস্তুত করণে ত্রিদোষের এবং রস, বীর্য, বিপাক প্রভাব প্রভৃতির সমস্নৈষিক প্রতিক্রিয়ার সমীকরণ কার্যকরী। দেহকে ভাগ ভাগ করিয়া দেখিলে আসল দেখা যায় না। উহা যেমন বৈজ্ঞানিক তেমন আধ্যাত্মিক। তাহা না হইলে রোগ নির্ণয়ে ও ঔষধ-প্রয়োগে একদেশদর্শিতা আসে; ফলে দেহে আভ্যন্তরিক সমতা সম্পাদন না করিয়া অসমতায় নূতন রোগ সৃষ্টি করে—সেজন্য রোগমুক্তি বাহ্যিক হইলেও অন্তরোগ সৃজনকে সাহায্য করে। আয়ুর্বেদের দর্শন শুধু দৈহিক স্তরে রোগনির্ণয়, রোগচিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিধি, দ্রব্যগুণ ও রসশাস্ত্র প্রভৃতির বিশ্লেষণ ও সংযোজনায় নয়—রসরক্তাদি ধাতুর প্রকৃতি, বিকৃতি ও ত্রিগুণ প্রভৃতির উপরে আত্মা বিরাজ করে যাহা জৈবজীবনকে সবল ও প্রাণবান করিয়া তোলে। মৃত্যু হইলেও দৈহিক উপাদান বর্তমান থাকে কিন্তু প্রাণস্পন্দন থাকে না। ইহার কারণ অনুধাবন করিতে গিয়া আর্ষঋষি আত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়াছেন। মৌলিক তথ্য আবিষ্কারে সুদর্শনের প্রয়োজন সর্বত্র। যেখানে বাহ্যিক লক্ষণ লক্ষণ হিসাবেই ধরা যায় সেখানে তাহার গূঢ় রহস্য যাহা শারীরক্রিয়ায় প্রতিফলিত তাহা অনুসন্ধান

করিবার শিক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা আজকে অবৈজ্ঞানিক রূপ ধারণ করে।

নালন্দা বিক্রমশীলা ও তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে কোন শিক্ষার সহিত আয়ুর্বেদ শিখিতে হইত কেননা স্বাস্থ্যরক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য। পুরাপুরি আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে যাহারা যাইত তাহাদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ছিল। অবশ্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন তখনও অনুভূত হইত—তাহার ফলে কায়চিকিৎসক আত্রেয় সম্প্রদায়, অস্ত্রচিকিৎসক ধন্বন্তরি সম্প্রদায়, বিষচিকিৎসক, রসচিকিৎসক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের দল গঠিত হইল। শুধু দল বাঁধিবার জন্য নয়, সাধনা ও গবেষণা করিবার—একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা জাগ্রত করিবার জন্য। তখনও বিদেশী ওষধি গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে তাহা নীতিগত করিয়া গৃহীত হইয়াছে। আজকালকার মত গঠন ও সৃজনপদ্ধতি না জানিয়া, নাম বদলাইয়া বা প্রকাশ্যে ব্যবহারের রীতি ছিল না, কারণ তাহা আয়ুর্বেদের উৎকর্ষের অন্তরায়। ক্রিমি বা জীবাণু স্বীকার করিলেও উহাকে সর্বক্ষেত্রে আদর্শ নীতিরূপে গ্রহণ করেন নাই, কারণ উহাতে ক্ষেত্র নির্মল হয় না বরং অন্য রোগের বীজ অঙ্কুরিত হয় পরিশেষে—কখনও কখনও তৎক্ষণাৎই। একদিকে যেমন দোষ-ধাতু-মল-মূল আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অন্যদিকে তেমন দেহের সামঞ্জস্যবিধান উহার নীতি। সুতরাং বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জ্ঞান অর্জন করিলেও সমবায়িক প্রকৃতি ও রোগে বিকৃতির বিশ্লেষণ ও তদনুসারে ঔষধ-নির্বাচন আয়ুর্বেদের মৌলিক বিধি। ন্যায়, দর্শন যোগদর্শন প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়াকলাপ ও বিজ্ঞানের নীতি-নির্ধারক—মানসিক ও আত্মিক যোগাযোগ গভীর জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি। শারীরিক স্তর হইতে আত্মিক স্তরে পরিণতির সাধনা তান্ত্রিক যুগে কুলকুণ্ডলিনী হইতে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না সাহায্যে যে ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, জন, মহ, তপঃ, সত্যলোক উৎকর্ষলাভ সে এক বিস্ময়কর দেহশুদ্ধির সোপান। ইহার সঙ্গে আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি ত আছেই।

শতাব্দির পর শতাব্দি আয়ুর্বেদের গবেষণা ও আবিষ্কারের যে মহড়া চলিয়াছে প্রাগবৈদিক, বৈদিক, বেদোত্তর, বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, মধ্যযুগে এমন কি, সুদূর য়ুরোপে, সিংহলে উহার প্রচার ও বিস্তৃতি—ইহা একটি অভূতপূর্ব ইতিহাস ভারতের বৈজ্ঞানিক সাধনার স্বাক্ষর রাখে। যুগের পর যুগ কত ঋষি, মুনি টীকাকার, গবেষক প্রভৃতি ঐ মহাযজ্ঞে আহুতি দিয়াছেন জ্ঞানের দেবীমুখে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সম্বন্ধে বিদেশী ঐতিহাসিক, গবেষক, মনীষীদের মন্তব্য, আয়ুর্বেদের প্রতি তাহাদের অতুলনীয় শ্রদ্ধার নিদর্শন। আয়ুর্বেদের এত ঐশ্বর্য থাকিতেও নানাকারণে, বিশেষভাবে বর্তমানে আয়ুর্বেদাত্মক রীতিতে অনুসন্ধান এবং গবেষণার অভাবে উহার গতিশীলতা কিছুটা নিষ্প্রভ হইয়াছে। পরন্তু আয়ুর্বেদের অগাধ বিজ্ঞান-বারিধিতে অবগাহন না করিয়া হাতের কাছে ডাক্তারী ঔষধ প্রয়োগ করিবার ঝোঁক উহার অনুশীলনে বিরতি আনিয়াছে। আয়ুর্বেদের গবেষণালব্ধ ঔষধ ও ওষধি হোমিওপ্যাথি, ডাক্তারীতে তাহাদের নীতিগত করিয়া গৃহীত হইতেছে—এদিকে আয়ুর্বেদসেবিগণ ডাক্তারী ঔষধ—তাহার গঠন ও যৌগিকক্রিয়া আয়ুর্বেদের নীতিগত না করিয়া ব্যবহার করিতেছেন কোন কোন ক্ষেত্রে—ইহার ফল মারাত্মক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। আয়ুর্বেদে ও অন্য বিজ্ঞানের ঔষধ নীতিগত করিয়া লইতে যে সাধনা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দরকার তাহার অভাবই ইহাতে উহন যোগাইতেছে। ফলে আয়ুর্বেদের প্রতি অজ্ঞতাজনিত অবজ্ঞা জন্মিয়েছে—

বিশ্বাস হারাইতেছে—বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনে অক্ষমতাই ইহার কারণ। যে অতন্দ্র সাধনায় এই আয়ুর্বেদ-মহীরুহ বিরাটকায় হইয়াছে, সেই সাধনার গঙ্গাধারা নামাইয়া আনিতে হইবে কবিরাজ, শুদ্ধ মুক্ত জনসাধারণের মধ্যে, তবেই ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান—আয়ুর্বেদের নবজন্ম সুরু হইবে।

সংমিশ্রণের মধ্যে যে আয়ুর্বেদের ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত আছে, তাহা আজ এত বৎসরের ফলাফলে উপলব্ধি করা যায়। আয়ুর্বেদকে বাঁচাইতে হইলে, একটা বিশিষ্ট ধারায় চিকিৎসাবিজ্ঞানকে রক্ষা করিতে হইলে এবং শুধু ভারতবর্ষের জন্য নয়, বিজ্ঞান ভাণ্ডারে আয়ুর্বেদের অবদান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ঋষিকল্পিত নীতি ও বিজ্ঞানের ধারায় মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া ভাবী আয়ুর্বেদের গবেষণায় নিয়োজিত হউন যাহারা বিজ্ঞানপিপাসু—ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী—তাহাতে অন্যান্য বিজ্ঞান এবং দেশের বিদেশের লোকেরও উপকারে আসিবে। হাজার হাজার বৎসরের পরাধীনতার পর স্বাধীনতার আগমনে আমাদের মনপ্রাণ স্বাধীন হয় নাই। আমরা পরদেশের জ্ঞানের ঠুলি চোখে দিয়া নিজের দেশের অবদানকে দেখিতে চাই—ভুল সেখানেই। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে আয়ুর্বেদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে—ইহা মন্ত্রীস্তরে যেমন, সদস্যস্তরেও তেমন আগ্রহের জন্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ যেন ভারত ছাড়া। কত সাধ্য সাধনায় ১৯৬১ সালে আয়ুর্বেদ বিল পাশ হইল—তিন বৎসর পরে একটা কলেজ সরকারী কর্তৃত্বাধীনে নেওয়া হইল। কিন্তু তাহার অগ্রগতি বা নতুন পরিকল্পনা আয়ুর্বেদের উৎকর্ষের জন্য দেখিতেছি না। জানি না, সংমিশ্রণের যে বিষ প্রায় অর্ধশতাব্দি পূর্বে আয়ুর্বেদের শিক্ষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ষোলকলায় পূর্ণ হইবে কি না সরকারী তত্ত্বাবধানে। আয়ুর্বেদের জন্য ভারত সরকারের আইনকানুন, বিল, কমিটি প্রভৃতির মহা-সমারোহের অন্তরালে এখন পর্যন্ত কিছু তেমন দানা বাঁধে নাই—ইহা একটা আশ্চর্যের কথা। ঘোটানায় পড়িয়া চলত, প্রকৃত কাজে হাত দিতে এত দেরী হইতেছে। গণতান্ত্রিক সরকারের গণদেবতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা অন্যায় ও অশোভন। আমার সুচিন্তিত মতের কিছুটা আভাস দিতেছি :

(১) আয়ুর্বেদের কোন কমিটিতে ডাক্তার থাকিতে পারিবে না বা আয়ুর্বেদ কলেজে ডাক্তারী চলিতে পারিবে না—যতটুকু চলিবে তাহা আয়ুর্বেদের নীতিগত করিয়া লইতে হইবে ; সুতরাং সংমিশ্রণ কার্যত বাদ পড়িয়া যাইবে, (২) চিকিৎসা ও পরিচর্যা ও সংগঠনে আয়ুর্বেদের ঐতিহ্য ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসরণ করিতে হইবে, (৩) অধ্যাপকদের সরকারের গেজেটেড অফিসারের গ্রেড অনুসারে মাহিনা দিতে হইবে, (৪) ঔষধ ও গ্রন্থের উপর গবেষণা করিবার জন্য গবেষকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে (৫) সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী কবিরাজের অধীনে শাস্ত্রীয় ঔষধ উদ্ধার ও যুগোপযোগী করিয়া সহজে গ্রহণযোগ্য ঔষধ উদ্ভাবন করিবারও ব্যবস্থা থাকিবে এবং (৬) ভেষজোদ্যান, গ্রন্থাগার, রসায়নাগার প্রভৃতি থাকিবে।

এখন পরিষদের গবেষণা কার্যে এবং বিভিন্ন বিষয়ে যাহারা সাহচর্য করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(১) শোথ—কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন, (২) হৃদ্‌রোগ ও যকৃৎরোগ—কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, (৩) অর্শরোগ—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, (৪) ভীষদেব ও ভারতীয় চিকিৎসা—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, (৫) আয়ুর্বেদে

অধ্যের ব্যবহার ও রীতিনীতি—কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৬) আয়ুর্বেদের দার্শনিকতা—পণ্ডিত শ্রীসতীন্দ্র নাথ ন্যায়াচার্য, (৭) ভূতবিদ্যা—কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় এবং (৮) রোগাদী-কম্' ও 'শ্রোতবিমানম্'—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার ইত্যাদি।

২৬তম আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা সম্মেলন, ১৬শ চরক প্রশস্তি দিবস পালন, ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী ও ডঃ কালিদাস নাগের মৃত্যুতে শোকসভা যথাক্রমে ১৯শে বৈশাখ, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১২ই কার্তিক ও ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ অনুষ্ঠিত হয়। কবিরাজ শ্রীবগলা কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ অনুষ্ঠিত ক্যান্সার-সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ প্রভৃতি। আলোচনায় যোগদান করেন কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা। এখানে পরিষদের বাৎসরিক কর্মবহুলতার কিছুটা উল্লিখিত হইল। আশা করি, আপনাদের সহযোগিতায় ইহা আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

যাহারা আমাদের কার্যে সহযোগিতা—গবেষণায় উপদেশ দানে সাহচর্য, আয়ুর্বেদের কল্যাণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং যাহারা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও সম্বর্ধনা জানাইতেছি। এখন আমি সহৃদয় ধর্মনিষ্ঠ, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক—পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজকে পরিষদের এই ৩৫তম বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

'বন্দেমাতরম্'

কবিরাজ শ্রীবগলা কুমার মজুমদার
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি

ঠিকানা :
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘারভাঙ্গা হলে, বিগত ৫ই মাঘ, ১৩৭৩, রবিবার আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৫তম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন— আমি কেরলে আয়ুর্বেদের পরিবেশের মধ্যে পরিপালিত। সুতরাং আয়ুর্বেদের বিস্ময়কর চিকিৎসার কথা জানি—দরকার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কার্যকারিতা। চরকের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুচিন্তিত উপদেশাবলি শুধু ইহ জীবনে নয়—পরকালের সঙ্গে সম্মিলিত। মানসিক ও দৈহিক চিকিৎসার উন্নয়ন করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিপুষ্টি প্রয়োজন। মানুষের যত কিছু কর্তব্য আছে তাহার মধ্যে দৈহিক নিরাময়তাই শ্রেষ্ঠ। ভারতের স্থানে স্থানে গবেষণাগার ও ভেষজোদ্যান থাকা দরকার। আমি পরিষদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রধান অতিথির ভাষণে জননেতা ও শিক্ষাবিদ

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ বলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে পরিষদ এই সুদীর্ঘ পঞ্চত্রিংশ বর্ষ যাবৎ জনসেবা করিয়া আসিতেছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও সদস্যগণ ধন্যবাদার্হ। আয়ুর্বেদ ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান। এই দেশের নাড়ীর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন সরকার, জনসাধারণ সকলের কর্তব্য। বর্তমানে পাশ্চাত্যের ভাব ও সাহেবিয়ানা চলিতেছে। আয়ুর্বেদের পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা উন্নতি সাধন করিতে হইবে। রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি কত বিদ্যার গবেষণা চলিয়াছে—ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলায় কতগ্রন্থ ভস্মসাৎ হইয়াছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র 'হিন্দু কেমিস্ট্রি' লিখিয়া আয়ুর্বেদের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা ডঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের—উহাও অপূর্ব। আমি পরিষদের শুভ কামনা করি।

প্রারম্ভে প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার পরিষদের কর্মাবলির বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুনরভ্যুত্থানের ও আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য কবিরাজদের সম্মিলিত ও ঐকান্তিক চেষ্টার কথা বলেন।

সভাপতি কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্র লাল দাশগুপ্ত বলেন—আয়ুর্বেদ কলেজের শিক্ষার মানবৃদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি কৃষ্টি, ঔষধ প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তা এবং টোলে নিখুঁত পড়াবার ব্যবস্থার অনিবার্যতা সম্বন্ধে বিকৃত আলোচনা করেন। পরিষদ যাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতির শিখরে উঠিতে পারে, সেজন্য সকলের সহযোগিতা ও আয়ুর্বেদের সেবায় একনিষ্ঠতা অবলম্বন করিবার জন্য আহ্বান জানান।

কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ স্বার্থপরতা ও দলীয় ভাব মুক্ত হইয়া একাগ্রভাবে আয়ুর্বেদের সেবায় নিয়োজিত হইবার কথা বলেন। ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্র পট্টনায়ক আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া প্রাচীন আয়ুর্বেদের তথ্যগুলি আয়ুর্বেদীয় নীতি রক্ষা করিয়া বর্তমান রোগ ও সমস্যা সমাধানের জন্য সকলকে আহ্বান করেন। পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ বলেন—অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকিলে জ্ঞান চর্চা হয়। লোভের জন্য ও লাভের আশায় লোকে অসদাচরণ করিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে দেশের অবস্থা পর্যালোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, অসংযমে যেমন দেশশাসন হয় না, তেমন অসংযত শিক্ষায় অন্যায় করিবার ঝোক বাড়ে। আয়ুর্বেদের রীতি শুধু রোগ বিদূরীত করা নয়, লোকের নীতি ও চরিত্রেরও পরিবর্তন সাধন-করা, যাহাতে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি বজায় থাকে। শ্রীহেরম্ব নাথ রায় বলেন—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ'—কবিরাজদের নিজের চিকিৎসা পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া উচিত। আয়ুর্বেদীয় ঔষধের বিস্ময়কর ফল কিন্তু চাই খাটি চিকিৎসক এবং খাটি ঔষধ। কবি শ্রীজগৎ দুর্লভ মুখোপাধ্যায় বলেন—আত্মোপলব্ধি চাই—সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া অগ্রসর হওয়া দরকার। আর বিজ্ঞানসম্মত প্রচার। শ্রীনরেন্দ্র নাথ নিন্দা ও পরিষদের উন্নতি কামনা করেন। শ্রীঅবনী কান্ত মৈত্র মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেদের অঙ্গ আয়ুর্বেদের শাশ্বতরূপ উদ্ঘাটন করেন। নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যে সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী আয়ুর্বেদ যে তাহার চিকিৎসা-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ইহা তাহার মৌলিক ও অভ্রান্ত নীতির জন্য। সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বহু জনহিতায় যে বিজ্ঞানের আবির্ভাব, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়া বৃহত্তর মানবতার

স্বার্থে সকলকে উদ্বুদ্ধ হইতে বলেন। সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, বক্তাগণ প্রভৃতিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

কলিকাতা, ষ্টুডেন্টস্ হলে, কায়চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, রসায়ন-বাজীকরণ, শারীরক্রিয়া-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শল্য, শালাক্য বিভাগে যথাক্রমে কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন, কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, কবিরাজ শ্রীপ্রভাত চন্দ্র সেন এবং কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার (পরিবর্তে) সভাপতির আসন গ্রহণকরত মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা বা অভিভাষণ পাঠ করেন।

কবিরাজ শ্রীচারুবালা বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীজ্যোতি প্রসন্ন সেন, শ্রীঅবনী কান্ত মৈত্র, কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীসূর্যকান্ত রায়, কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অনিল কুমার দত্ত, কবিরাজ শ্রীঅতুল বিহারী দত্ত, কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করেন।

যুগধর্ম ও সমাজবোধ সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতাদানপ্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন বলেন—ভারতের সনাতন ধর্মের কোন পরিবর্তন নাই—উহা চিরন্তন—রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্ম এই চারি প্রকার ধর্ম—বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের করণীয় কর্মের যোগাতা। ভারতে বিভিন্ন ধর্ম শৈব, শাক্ত, আউল, বাউল, সহজিয়া প্রভৃতির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা কলহ ছিল না। এই উদারতা ও সহনশীলতা ভারতের বিচিত্র সভ্যতার মূলস্বরূপ। মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত সকলের কল্যাণ চিন্তা। পূর্বে পরাধীনতার মধ্যেও সমাজবোধ সুস্থির ছিল। কেন না, রাজনীতির দৌরাত্ম্য পল্লীজীবন কলুষিত বা পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। বৃটিশ যুগে সমাজ শিথিল হইয়াছে—সেই স্রোতে চলিতে চলিতে এখন বন্ধনহীন মুক্ত বিহঙ্গের অবস্থা। আজ কর্তব্য শিক্ষাকে চরিত্রগত করিয়া নেওয়া। তবেই শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করিবে। পথ্যাপথ্য এবং সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা যথাক্রমে প্রদান করেন কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ এবং কবিরাজ শ্রীহরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় শুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় বোর্ডের সদস্য। মুরারি বাবু চরকের 'বিবিধাশীতপীতীয়' অধ্যায় সম্বন্ধেও আলোচনা করেন।

সংযম ও আধুনিকতা সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রদানপ্রসঙ্গে ডঃ রমেন্দ্র নাথ সেন বলেন, সংযম অনাচারে চলিয়া গিয়াছে। অতীত ও বর্তমানের আদর্শ ও কার্যাবলীর পার্থক্য আছে। ভোগ্য বস্তুর ভিতর দিয়া মোক্ষ লাভ হইতে পারে—চরক ও সুশ্রুতের মধ্যে ইহা ব্যক্ত হইতে আসিয়াছে। লোকের দূর দৃষ্টি নাই—ভোগকে ভোগদৃষ্টিসাবে দেখে বলিয়া ওখানেই কর্মপ্রবাহ সমাপ্ত। ভারতের ঋষিগণ কেহই ভোগকে বাদ দিতে চান নাই। ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শও তা-ই। পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনে আয়ুর্বেদ—যুগোপযোগিতা আয়ুর্বেদের মধ্যে আছে। পরম ভোগ চরম ত্যাগে পৌঁছিয়াছে—ইহাই ভারতীয় সভ্যতার গূঢ় রহস্য।

অধ্যাপক শ্রীকিতীশ চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন—শাস্ত্র বেদ বেদান্ত বেদমূলক। 'সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্' হঠাৎ কোন কর্ম করিবে না। গুরুজন জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ সকলের উপদেশ গ্রহণীয়। আজ অশ্রদ্ধার মধ্যে অস্থায় করিবার প্রয়োজন নিহিত। এই কয়দিনের আলোচনা খুব সুফলপ্রদ ও তথ্যপূর্ণ হইয়াছে—ইহা আনন্দ ও উৎসাহের কথা।

নবম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৭৩

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে নবম বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন প্রসঙ্গে পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় গত চার দিনের বার্ষিক অধিবেশনের কার্যাবলী বর্ণনা করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত আয়ুর্বেদের যে-ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় আর্যঋষিরা চিকিৎসার কি সার্বভৌমত্ব প্রচার করিয়াছিলেন! দৈহিক রোগের সহিত মানসিক রোগ এবং তাহার সঙ্গে আত্মিক উৎকর্ষ কিভাবে হইতে পারে তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সেখানে অন্তর্নিহিত। সুতরাং আজকের সংস্কৃতি সম্মেলন বৃহত্তর সমাজগঠনে সম্পূর্ণ মানুষের সৃষ্টি ও সুবিন্যস্ত করে যে প্রভূত আলোক সম্পাত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কবিরাজ শ্রীযমসাচরণ সেন বলেন—আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ সাধনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া দরকার। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আয়ুর্বেদের অবদান অনস্বীকার্য। আজ তাহাকে আরও উন্নত করিবার দায়িত্ব কবিরাজদের উপর। কলিকাতা হাই কোর্টের এডভোকেট শ্রীপতিতপাবন চট্টোপাধ্যায় বলেন, আয়ুর্বেদের পুনঃ গবেষণার মাধ্যমে ইহার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র শাস্ত্রী বলেন—যতদিন ভারত থাকিবে, ততদিন আয়ুর্বেদ থাকিবে। আয়ুর্বেদ বেদের অঙ্গ—শাশ্বত। স্বাস্থ্যনীতি-সম্বন্ধে বলিতে গেলে আয়ুর্বেদের মত স্বাস্থ্যনীতির বিস্তৃত আলোচনা কোথাও নাই। 'রীতিঃ কাব্যস্য আত্মা'-কাব্যের যেমন রীতি, চিকিৎসারও তেমন রীতি আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের সংস্কৃতি, কারণ ইহার মধ্যে কত সংস্কৃতির স্রোত আসিয়া মিলিয়াছে।

কথাশিল্পী শ্রীঅবনীকান্ত মৈত্র বলেন—মার্গ-সঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন সুর তাল বাঁধাধরা আছে, জীবনে ও শাস্ত্রে—আয়ুর্বেদে ও চিকিৎসা-পদ্ধতিতে একটা রীতি আছে—সুরজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্ঞান-সম্পদে ভরপুর। আজ এই সম্মেলন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোয় দেদীপ্যমান। কবি শ্রীজগৎ দুর্লভ মুখার্জি বলেন—ছানিপড়া চোখে যেমন কিছু দেখা যায় না, তেমন বিদেশী প্রভাবে অভিভূত মন নিজের দেশের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয় না। জ্ঞানের রাজ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সীমারেখা না থাকিলেও প্রতি দেশের কৃষ্টি—প্রতি বিজ্ঞানে বিশেষত আয়ুর্বেদে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাহাকে আজ আরও উন্নত করিবার দায়িত্ব সকলের। উপসংহারে সম্মেলনের সভাপতি কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চ্যাটার্জি বলেন—আজ এই ভারতীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক-যোগে চলে। সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থে আয়ুর্বেদও অন্তর্ভুক্ত। ভারতের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃক্ষ সমস্ত বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; এখন আবার তাহাকে সঞ্জীবিত করিতে হইবে। আয়ুর্বেদের চর্চা ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব যাহাদের হাতে, তাহারা বিদেশী ভাবাপন্ন; তাই কোন জিনিসই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে না। চাই ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ভাবধারার উন্নতি; তবেই তাহার সহিত মিশ্রিত যে আয়ুর্বেদ তাহাও উন্নতি লাভ করিবে। সাধনা আবার নূতন করিয়া সুরু করিতে হইবে। আবার সাধনার মর্মমূলে

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টি উৎসারিত করিতে হইবে।

প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণপদ মুখার্জি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। মাননীয় সভাপতি, বক্তাগণ ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ দানের পর বার্ষিক সভা এ বৎসরের মত সমাপ্ত হয়।

২৭তম আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা সম্মেলন, ১৩৭৪

স্থান—ষ্টুডেন্টস্ হল, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
বৃহস্পতিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৪, বেলা ৪টা

কার্যক্রম :

১। মাঙ্গলিকী
২। উদ্বোধক ও সভাপতি বরণ এবং মাল্যদান
৩। নববর্ষের আনন্দ ও সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন—
কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার
৪। উদ্বোধন—বিচারপতি
ডঃ শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। আরোগ্যশালার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও উৎকর্ষের উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠ :

(ক) বহির্বিভাগের চিকিৎসাপদ্ধতি—কবিরাজ শ্রীকবিভূষণ রায়, ভিষগ্‌রত্ন এবং কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কাব্যতীর্থ (বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহা-বিদ্যালয়)।

(খ) অন্তর্বিভাগের অভাব ও উৎকর্ষ সাধন—কবিরাজ শ্রীসূর্যকান্ত রায়, ভিষগ্‌রত্ন এবং কবিরাজ শ্রীসুশীল কুমার সেনগুপ্ত ভিষগ্‌রত্ন।

(গ) সংগঠন ও পরিচর্যা—কবিরাজ শ্রীশ্রীধর স্থ ও শ্রীকালী মোদি (আরোগ্যকী রিলিফ্ সোসাইটি)।

(ঘ) অসাধ্য রোগের অনুশীলন ও রোগানুযায়ী পথ্যাপথ্যের বিচার—কবিরাজ শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়।

(ঙ) উদর চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন এবং মিশ্র চিকিৎসা—কবিরাজ শ্রীহেরম্বনাথ শাস্ত্রী (শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ)।

(চ) ধাত্রীবিদ্যা—কবিরাজ শ্রীমাখোবপদ শর্মা (বঙ্গলা হাসপাতাল)।

৬। চিকিৎসা ও মানবতা—অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরা-শঙ্কর সেনশাস্ত্রী।

৭। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতা।

৮। সভাপতির অভিভাষণ—কবিরাজ শ্রীমিতি-কণ্ঠ দত্ত মজুমদার।

৯। ধন্যবাদ—কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক।

বিবরণী

বিগত ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৪, কলিকাতা ষ্টুডেন্টস্ হলে ২৭তম আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা সম্মেলনের (১৩৭৪) উদ্বোধনপ্রসঙ্গে বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ আধুনিক মতে হইতে পারে না। আয়ুর্বেদের জাতি নীতি অনুসরণ করা দরকার। আজকাল সংস্কৃত জানা পণ্ডিতের বড় অভাব তাই আয়ুর্বেদ পঠন পাঠনে বাধা উপস্থিত হইয়াছে। মুসলমান আমলেও এই অবস্থা ছিল না। বর্তমানের অগ্রগতি কি না দেশের সভ্যতা ও বিজ্ঞান ধারকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ আজ কোথায়! সব ভেকালে ভরিয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এই দেশে যে-সমাজবাদ আছে—তাহার চেয়ে কোথায়

অতিরিক্ত আছে? পরিবার পরিকল্পনায় সমাজের নীতি ও শাশ্বতভাবোধ নির্মূল হইবে। যাহারা আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহারা প্রকৃত দেশের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে উন্নত ও বাঁচাবার জন্য অগ্রণী হইয়াছেন। আমি তাহাদের, পরিষদ ও উদ্যোক্তাদের সাফল্য কামনা করিতেছি।

সভাপতি কবিরাজ শ্রীশিতিকণ্ঠ গুপ্ত মজুমদার বলেন—ডাক্তারীর সংমিশ্রণে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ ব্যাহত হইতেছে। আয়ুর্বেদে জ্ঞান পরিপুষ্ট হইলেই আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ লাভ হইবে—ডাক্তারীর সাহায্যে আয়ুর্বেদের অবনতি হইতেছে। হাসপাতালের চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে কবিরাজী ঔষধের দ্বারা হওয়া উচিত। হাসপাতাল রোগীর সেবা করিবার স্থান, আবার হাতে কলমে আয়ুর্বেদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পরিপুষ্টি লাভের পন্থা। আয়ুর্বেদের মৌলিক তত্ত্ব—আয়ুর্বেদের গ্রন্থ পড়াবার লোকের অভাব—ওদিকে ছাত্ররা সংস্কৃত জানে না। জ্ঞানলাভ করিবার আগ্রহই বিজ্ঞানকে উন্নত করে—সাধনার উৎসাহে নব নব উন্মেষের দ্বার খুলিয়া যায়। আজ কর্তৃপক্ষ, সরকার, জনসাধারণ ও অধ্যাপকগণ একত্রে এই ডাক্তারী বাদ দিয়া আয়ুর্বেদ শিক্ষার ব্যবস্থা করুন তবে আয়ুর্বেদ রক্ষা পাইবে।

সম্বর্ধনা জ্ঞাপনপূর্বক পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার বলেন যে, আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা একদিকে যেমন সেবায়তন, অন্য দিকে তেমন চিকিৎসা-শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের স্থান। বিভিন্ন হাসপাতালের মধ্যে সহযোগিতা এবং তথ্যাদির আদান-প্রদানে পুরাতনের প্রত্যক্ষীকরণ ও নূতনের আবিষ্কারের পথ সুগম হইবে। আয়ুর্বেদের এই দুর্দিনে সকল ব্যক্তিস্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপনারা আয়ুর্বেদের উৎকর্ষসাধের কর্তব্য পালনে উৎসাহী হউন, এই আমার অনুরোধ। সরকারের উচিত কলেজ ও হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কবিরাজদের মাহিনা ও স্বাচ্ছন্দ্য মেডিকেল কলেজের আদর্শে বৃদ্ধি করা। এতদিন ত্যাগের কৃচ্ছ্রতা সহ্য করিয়া এখন স্বাধীনতার যুগে অর্থ ও মর্যাদা দুইই তাহাদের প্রাপ্য। ইহা শুধু ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য নয়, আয়ুর্বেদের অবাধ উৎকর্ষের জন্যই প্রয়োজন।

কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য বলেন—দোষ-ধাতু-মল বিজ্ঞানই আয়ুর্বেদের চিকিৎসার মূল-নীতি। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যে রোগ সারিতে পারে কিন্তু বেশীর ভাগ স্থানেই বহু দ্রব্যের মৌলিক প্রয়োগ আয়ুর্বেদে দেখা যায় এবং বর্তমানে চিকিৎসার উভয় পন্থাই চলে। কাঁচা দ্রব্যের কি ফল হয় তাহা জানা-না-থাকায় কোন কোন ডাক্তার ও বিজ্ঞানী আয়ুর্বেদের সুফলপ্রদ ওষধি—প্রায় ২৫০টিকে অকেজো বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাহাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ও আয়ুর্বেদের প্রায়োগিক ফলে অবিশ্বাসের পরিচয়। দ্রব্যের কাঁচা ও শুকনা অবস্থার মধ্যে যে গুণের প্রভূত তারতম্য আছে, সে-বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ। সুতরাং আয়ুর্বেদের নীতি ও প্রয়োগ-প্রথার প্রতি দৃষ্টি রাখা সকলের কর্তব্য। উদররোগ সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেনের প্রবন্ধ তাঁহার অনিবার্য অনুপস্থিতিতে কবিরাজ শ্রীগোপাল চন্দ্র সেন গুপ্ত পাঠ করেন।

কবিরাজ শ্রীসূর্যকান্ত রায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলেন—বর্তমানে ধাতু ও ওষধির অভাবে—মূলাটিকা ও ডেজালের জন্য

ঔষধ প্রস্তুতে বিভ্রাট চলিয়াছে। সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করিতেছি। অনুপানের বিকল্প ব্যবস্থাহিসাবে অনুপানের চূর্ণ বা উহার রস ভাবনা দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপত্রের সহিত খাঁটি ও সহজলভ্য গাছ গাছড়া ও ধাতু সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহার সমাধান করা প্রয়োজন।

'চিকিৎসা ও মানবতা' সম্বন্ধে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুড়াশঙ্কর সেনশাস্ত্রী বলেন—ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে জনসাধারণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, এমন কি, ধর্মমাত্রই মানবতার পরিপোষক। ধ্যান দৃষ্টি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে বেদ বলে—নাড়ী বিজ্ঞানে অন্তর্যোগ-সূত্র আছে। অহিংসা প্রাণীনাং প্রাণবর্দ্ধনম্, অর্থাৎ অহিংসা প্রাণীদের প্রাণ পুষ্ট করে; বিদ্যা দেহ মন উভয়ের কারণ। ভূদেববাবু বলিয়াছেন রোগীর সেবা আর দেবতার সাধনা একই। সংস্কৃত ভাষায় ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিকতা নিহিত। আত্মকেন্দ্রিক হইলে দেশের কি মানবতার সেবা করা দুষ্কর। নাগার্জুন প্লেটোর চেয়ে কম ছিলেন না বসশাস্ত্র এবং আত্মানুভূতির দিক দিয়া। 'মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা যোগী মহেশ্বরঃ।' 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্'—আদর্শবান লোকের এইরূপ অনুভূতি থাকাই উচিত।

ডাক্তারী হিসাবে রোগ নির্ণয়ে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা চলে না—ত্রিদোষতত্ত্বের নিরীখে আয়ুর্বেদের চিকিৎসা। আজ শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদের উপর চিন্তাধারা নিবদ্ধ থাকা দরকার; তাহা হইলে চিকিৎসার হৃতসূত্র আবার জাগ্রত হইবে। অবশেষে সম্পাদক কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধক, সভাপতি, বক্তাগণ এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

ফোন—৩৪-৪০৩৯

রাজবৈদ্য ডক্টর শ্রীপ্রভাকরের

সোমরস

হজমশক্তি, কর্ম্মশক্তি, স্মৃতি ও রক্তবর্দ্ধক

শ্রেষ্ঠ টনিক—৪৲ টাকা মাত্র

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ-ভবন

১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Seminar on M. M. Bijoyratna Sen and his technique of Ayurvedic treatment

The following are, in a nutshell, the proceedings of the Seminar mentioned above, held on Jan. 6, 1967 at the J. B Astanga Ayurveda College, Calcutta. Kaviraj Manindra Lal Das Gupta, M. A., M. B., Adviser in Ayurveda, Government of West Bengal, presided over the seminar.

In his introductory note, the administrative and development officer of this institution briefly traced the origin of seminars from the epic age of Mahabharata and Ayurvedic tradition and stated that against this hoary and sacred background, the authorities of this institution had launched upon this programme of holding, from time to time, seminars on Ayurveda and related subjects as an aid to the developmental efforts of this institution, now being run as the State Ayurvedic College and Hospital in West Bengal.

2. Sri N. M. Chaudhuri, special officer (ex-officio), assistant secretary, Government of West Bengal, Department of Health, very kindly inaugurated the seminar. He pointed out, inter alia, that it had been very proper to hold the first seminar on the subject mentioned, in as much as it was Kaviraj Bijoyratna Sen, the precepter of Kaviraj Jamini Bhusan Roy, the founder of this institution, who ardently wished that such seminars should be frequently held for the interchange of ideas amongst physicians of the different systems of medicine. He also expressed the hope that holding of seminars would be a regular feature in this institution when learned and renowned scholars would be invited to join in the deliberations.

3. Kaviraj Prabhakar Chatterjee, M.A., D.Sc. (J.A.U.), Member, Panel on Ayurveda and other systems of Medicines, Planning Commission, Government of India, was then pleased to deliver his erudite and masterly oration on the subject. He prefaced the emergence of Mahamahopadhyaya Kaviraj Bijoyratna Sen against the broad canvas of the glorious history and brilliant traditions of Ayurveda. He pinpointed to the independent thinking and open-minded approach of Kaviraj Bijoyratna Sen in the task of regenerating research activities in the realm of Ayurvedic treatment and reviving the stream of research which gained its vigour with the appearance of Vagbhata of

"Astanga Ayurveda" fame, meandering through the courses of time almost unnoticed through the unclaimed & formally unanounced activities of Ayurvedic practitioners like 'Brinda Kunda of Chattala' of 'Siddhayoga Samgraha' repute in the 10th Century A.D., Chakrapani Dutta in the 11th Century A.D., Shivadas in the 15th Century A.D., Bhabamistra of the 16th Century A.D., Krishnadas Visharad in the 18th Century A.D. and Gangadhar Roy in the 19th Century A.D. He also eloquently mentioned about the physicians and scholars like Dr. Jameson and Dr. Tytlar who used to take a very great interest in the teaching of Sushruta with the help of Western Anatomy and Surgery in the Calcutta Sanskrit College. Thereafter he related the professional and literary activities of Kaviraj Bijoyratna Sen who was always guided with a critical spirit of enquiry in his practice and was never afraid of declaring the results accordingly. It was also revealed from his discourse that Mahamahopadhyaya Bijoyratna Sen was the first among the Purbacharyas who showed that a good selection of an * allopathic ingredient with a view to mixing it with Ayurvedic preparation is necessary for the growth and development of the science of Ayurveda and all the distinguished Purbacharyas of Calcutta with the exception of a very few, had since then been utilizing special allopathic medicinal ingredients in the preparation of their special medicines necessary for special purposes in the course of their every day practice.

The great poet Nabin Chandra Sen, Justice Chandra Madhab Ghosh, Sir Ashutosh Mukherjee, Dr. Hem Chandra Sen, M.D., Dr. Bamandas Mukherjee, Mahamahopadhaya Gananath Sen and Kaviraj Jamini Bhusan Roy, his most beloved disciple were the persons with whom Mahamahopadhyaya Bijoyratna Sen used to sit in consultation for the future of Ayurveda. Kaviraj Prabhakar Chatterjee concluded his lecture on the techniques of Bijoy Ratna's treatment by a reference to the treatment of the then Chief Secretary of the Government of India who was attacked with the paralysis of tongue. All the Civil Surgeons of Calcutta and other military doctors could not cure him but Bijoyratna successfully cured him by the application of a few doses of medicines

* Without showing any disrespect to anybody it must be admitted that use of allopathic medicines in the guise of Ayurvedic ones to show off one's talent and success in treatment, is not only a professional misconduct but also a bar to further research in the Ayurvedic line and more so for want of processing them on the principles of Ayurveda to have any scientific background for such application. It has brought money but no advancement of the science of Ayurveda as is manifest now. The sooner it is stopped the better for the development of Ayurveda. --Founder-Editor.

and an external ointment and a decoction known as Masbaladi. In fine, he stated in the words of the poet that Bijoy was a type of the wise who soared but never roamed, true to the kindred points of heaven and home.

4. The President. in course of summing up the discussion in the seminar described the discourse so kindly delivered by Kaviraj Prabhakar Chatterjee as full of thought-provoking informations and showing the amount of pain the learned Kaviraj had taken to prepare the same in his old age. Kaviraj M L. Das Gupta, the president himself being a grand son by the elder sister of Bijoyratna Sen. in a reminiscent mood referred to the vast scholarship in sanskrit of Kaviraj Bijoyratna Sen, who used to be consulted by eminent Sanskritic scholars of Benaras at that time.

5. Kaviraj Surja Kanta Roy, one of the Convenors of the Seminar, expressed thanks to the Chair, to the inaugurator and to the distinguished guest and lecturer for their kindly participating in this pioneer seminar launched upon in the Golden Jubilee year through which the institution was passing on. He also expressed that this well-inaugurated programme would continue to inspire the members of the teaching and medical staff in holding the seminar as a regular feature.

মধুমেহ (Diabetis)*

কবিরাজ শ্রীমতিলাল ভাদুড়ী শাস্ত্রী, বি এ, এল্-এ-এম্-এস্ ও এম্ এ, এস্, এফ্.

বহুপ্রকার বিজ্ঞানের বহুমুখী তত্ত্বানুসন্ধান এবং চমকপ্রদ আবিষ্কার মনুষ্যসমাজকে আলোড়িত করেছে। এসব মতামত দ্বারা কম বেশী সব দেশেরই প্রাচীন ধর্মমত, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং জীবনদর্শন আক্রান্ত এবং বিধ্বস্ত ; এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই পতনাভ্যুদয় বন্ধুর পথই প্রগতির পথ। সৌভাগ্যের বিষয়, এই নবজাগরণের আদি গ্রহণে ভারতবর্ষ সর্বৈব বঞ্চিত হয় নাই। ইংরাজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাবধারার সঙ্গে আমাদেরও কিছু পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে। এ পরিচয় যেমন অশুভ, তেমনি আমাদের দেশে ও ভাবরাজ্যে বিপ্লবেরই সূচনা করেছে। কিন্তু এ বিপ্লব স্বাভাবিক এবং কাম্য ; পৃথিবীর নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে সনাতন সংস্কার আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকার মধ্যে নিশ্চিন্ততার আরাম থাকতে পারে, কিন্তু গৌরবের কিছু নাই। কূপমণ্ডুক হয়ে থাকার মধ্যেই সাংস্কৃতিক মৃত্যু। নূতন আলোতে পুরাতনের মূল্য যাচাই হবে এবং নূতন পুরাতন নির্বিশেষে প্রত্যেককেই তার যথাযোগ্য স্থানে

অধিষ্ঠিত করতে হবে। এই উপায়ে পূর্বতন উত্তরাধিকার চলতি যুগের সঞ্চয়ের সঙ্গে, সমন্বয়ে যা গড়ে উঠবে, তাই হবে জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদের যুগের নিজস্ব সম্পদ।

প্রতীপ্য ভাবধারা

প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতে সর্বত্র শর্করার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণ করে ইহা নিরূপণ করেছেন। জল এবং অঙ্গার উপাদানে শর্করার সৃষ্টি। এই কারণে শর্করাকে Carbohydrate অর্থাৎ জল সংযুক্ত অঙ্গার বলা হয়। শর্করাকে বহুশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা :—দ্রাক্ষা-শর্করা, ফল-শর্করা, দুগ্ধ-শর্করা, যব-শর্করা, ইক্ষু-শর্করা, শ্বেতসার, যকৃত-শর্করা (Glycogen), ডেকট্রিন (Dextrin) সেলুলোজ (Cellulose) প্রভৃতি। যে কোন প্রকার শর্করাই খাদ্যের সহিত গৃহীত হোক না কেন, রক্তের সহিত উহার সংমিশ্রণ ঘটে গ্লুকোজরূপে। কিন্তু রক্তে গ্লুকোজের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হার আছে যথা, এদেশে ০·১—০·১১। দেহের ওজনের প্রতি কিলোগ্রামে ০·৮ গ্রাম গ্লুকোজ, ইনজেকশন্ করে রক্তের সহিত মিশ্রিত করলে ঐ পরিমাণ গ্লুকোজ দেহের কার্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়; অথচ রক্তে পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। এই কারণে যে পর্যন্ত রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ ০·১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি না হয়, সে পর্যন্ত অতিরিক্ত পরিমাণে গ্লুকোজ গ্রহণের ফলেও মূত্রের মধ্যে গ্লুকোজ দেখতে পাওয়া যায় না।

শর্করা assimilationএর ক্ষেত্রে যকৃত Bankerএর কাজ করে। অতিরিক্ত শর্করা খাদ্যের সহিত গৃহীত হয়ে যখনই Glucose রূপে যকৃতে উপস্থিত হয়, তখনই গ্লাইকোজেনেজ নামক এনজাইম দ্বারা গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়ে কতকটা পেশীতে এবং অধিকাংশ যকৃতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। পেশীগুলিতে শর্করার সমধিক ক্রিয়া হয়ে থাকে। সঞ্চালন, বিচালন মাধ্যমে পেশীতে গ্লাইকোজেন নিঃশেষিত হলে পেশীর পুনরায় শর্করা প্রয়োজন হয়। তখন যকৃত নিজস্ব সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে রক্তপ্রবাহ মাধ্যমে পেশীতে শর্করা (Glycogen) প্রেরণ করে। এই প্রক্রিয়াতে রক্তে কিন্তু glucoseএর স্বাভাবিক পরিমাণের বড় একটা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যকৃতের ক্রিয়া খারাপ হলে, অথবা যকৃৎ দুর্বল হয়ে পড়লে যকৃতের শর্করা সঞ্চয় করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন রক্তে শর্করার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হয়।

রক্তবাহিত শর্করা assimilated হয় ইন্সুলিন্ সাহচর্যে অগ্ন্যাশয়ে (Pancreas)। যদি কোন কারণে অগ্ন্যাশয়ের বিপাকৃত বিটা (B. Cells) কোষগুলি বিকৃত হয় তবে ইন্সুলিনের অন্তঃক্ষরণ হয় না—শর্করাও পরিপাক প্রাপ্ত হতে পারে না। Non-assimilation of sugar in the Pancreas causes Diabetis mellitus.

মূত্রগ্রন্থী বা বৃক্কের শর্করা ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। আপেল গাছের শিকড়ের ত্বক হতে ফ্লর হাইজিন (Plorhidzin) নামক গ্লুকোসাইড উৎপন্ন হয়। ফ্লর হাইজিন Injection করে মূত্রগ্রন্থির শর্করা ধারণের ক্ষমতা নষ্ট করা যায় এবং কৃত্রিম (Experimental) বহুমূত্র (Diabetis) সৃষ্টি করা যায়। বস্তুত মূত্রগ্রন্থি বা বৃক্কের শর্করা ধারণ ক্ষমতা হ্রাস হেতু বৃক্কজ বহুমূত্র (Renal Diabetis) জন্মে।

Claude Bernard দেখিয়েছেন যে সুষুম্না শীর্ষকের কোন একটি বিশিষ্ট স্থানে সূচিকা প্রবেশ

করলে Diabetis বা বহুমূত্র হয়। সুষুম্না শীর্ষকের এই স্থানটি শর্করা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নিঃসন্দেহ।

সার সংক্ষেপে বলা যায়—নানাপ্রকার বহুমূত্র রোগের মধ্যে অগ্ন্যাশয়ের বৈকল্যহেতু মধুমেহই প্রধান কিন্তু যকৃত ও বৃক্কের বৈকল্যও উপেক্ষনীয় নহে।

বহুমূত্র চিকিৎসার প্রথম ধাপে বৃক্ক ও যকৃতের উপর নজর রাখা হয়। দ্বিতীয় ধাপে বাহিরের শর্করা রোগীকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তৃতীয় ধাপে ইন্সুলিন্ Injection করে রক্তের শর্করা পরিপাক করার চেষ্টা করা হয়। এরূপ চিকিৎসার ফলে অগ্ন্যাশয় বিশ্রাম পায়—বিকৃত বিটা (B. cell) কোষগুলি ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে ওঠে কিন্তু রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার কথা দুঃস্বপ্ন।

প্রাচ্য ভাবধারা

Cosmic elements ক্ষিতি মহাভূত ও তাপ মহাভূতের সংমিশ্রণে মিষ্টি রস সৃষ্ট হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের দান সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আয়াস। মানুষ যখন এই আয়াসের মধ্যে নিজেকে বিলীন করে, তখনই দেখা দেয় মধুমেহ। সেই হেতু মধুমেহ বা প্রমেহের কারণ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদকার বর্ণনা করেছেন—

"আস্যাসুখং স্বপ্নসুখং দধীনি,
গ্রাম্যৌদকানূপরসাঃ পয়াংসি,
নবান্নপানং গুড়বৈকৃতঞ্চ প্রমেহ হেতুঃ
কফকৃচ্চ সর্বম্।
(মাধব নিদান)

অর্থাৎ বসে বসে দিন গুজরান, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নানন্দ ভোগ—এক কথায় অলসতা বা কুড়েমি, অতিরিক্ত দধি দুগ্ধ পান, জলজ (কচ্ছপ, কাঁকড়া ও মাছ) প্রাণীর মাংস অতিরিক্ত ভোজন, অধিক মাত্রায় নূতন চালের মিষ্টান্ন আহার, গুড়, চিনি, বাতাসা দ্বারা তৈরী মিষ্টি বেশী মাত্রায় ভক্ষণ এবং যাবতীয় শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক আহার্য সেবনে প্রমেহ রোগ উৎপন্ন হয়।

আবার চক্রপাণি দত্ত প্রমেহ চিকিৎসা বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—

"পাদত্রচ্ছত্ররহিতো ভিক্ষাশী মুনিবদ্ ব্রতঃ
যোজনানাং শতং গচ্ছেদধিকং বা নিরন্তরম্।"

মহামতি সুশ্রুত তো চিকিৎসাপ্রসঙ্গে বলেই ফেললেন—

"মহাবনে মৃগৈঃ সহ ব্রজেৎ"। বনে মৃগের সহিত বসবাস, মৃগের অনুকরণে শাকসব্জী ভক্ষণ এবং ছুটাছুটি করা। মহামতি সুশ্রুতের লক্ষ্য কি ?

ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিদের মতবাদ অনুশীলনে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, ক্ষিতি ও অপ্ এই দুই মহাভূতের সংস্রব থেকে মানুষ যতই দূরে সরে যাচ্ছে, ততই প্রমেহ রোগপ্রবণ হচ্ছে। যে মানুষ প্রতিনিয়ত জল ও মাটির সংস্রবে থাকে অর্থাৎ খেটে খাওয়া মানুষ, মেহনতি মানুষ তার এই রোগপ্রবণতা নাই বল্লেই চলে।

শিশু মাটিতে খেলা করে, মাটি মাখে—মাটিতে গড়াগড়ি দেয়—জল কাঁদা মাখা শিশুর স্বভাব। মানস-সচেতন অবুঝ শিশুর গতি প্রকৃতি খুশি—সেই হেতু শিশুদের এই রোগ হয় না বললেই চলে। "মেহতি ইতি মেহঃ" অর্থাৎ শরীরের সারপদার্থসমূহ নিরন্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় (অবশ্য প্রস্রাব মাধ্যমে); আবার সারপদার্থ বলতে কেবল মিষ্ট রস নয়। সেই হেতু আয়ুর্বেদকার পশ্চিমী ভাবধারার মত এই

রোগকে মিষ্টরস ক্ষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিম্নলিখিত বিংশতি প্রকার প্রমেহ (বা মূত্রমার্গে ক্ষয়) বর্ণনা করেছেন :

(ক) কফজ ১০ প্রকার, যথা,

উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ লালামেহ। এই দশপ্রকার সাধ্য।

(খ) পিত্তজ ৬ প্রকার, যথা,

ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হারিদ্রমেহ, মাঞ্জিষ্ঠমেহ, রক্তমেহ। এই ছয় প্রকার যাপ্য।

(গ) বাতজ ৪ প্রকার, যথা,

(১) বসামেহ (সুশ্রুত এই মেহকে সর্পিমেহ আখ্যা দিয়েছেন), (২) মজ্জামেহ, (৩) ক্ষৌদ্রমেহ (চরক এই মেহকে মধুমেহ নামে বর্ণনা করেছেন), (৪) হস্তিমেহ। এই চার প্রকার প্রমেহ অসাধ্য। সর্বপ্রকার প্রমেহই চিকিৎসিত না হলে মধুমেহে রূপান্তরিত হয়। আবার এই রোগ উপেক্ষিত হলে দশবিধ পিড়কা জন্মে, যথা—সরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিনী, বিদারিকা, বিদ্রধি প্রভৃতি।

যুক্তি মাধ্যমে দর্শন আয়ুর্বেদের দান। সেই হেতু আয়ুর্বেদকে যুক্তিদর্শন বা সপ্তম দর্শন বলা যায়। প্রমেহ রোগের প্রকার ভেদ বা নামাকরণ যুক্তি মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ; অথচ কোন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে এই যুক্তিবাদ অনুশীলন করা হয় নাই।

"দোষ ধাতু মল মূলং হি শরীরম্" অর্থাৎ—

দোষ—বায়ু, পিত্ত, কফ—৩ প্রকার

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, অস্থি,

মেদা, মজ্জা, শুক্র ও ওজঃ—৮ প্রকার

মল—স্বেদ, মূত্র ও পুরীষ—৩ প্রকার

—মোট ১৪ প্রকার।

এই চতুর্দশ উপাদানে শরীর। আবার এই শরীর রক্ষণে বর্ধনে প্রয়োজন আহার্য। এই আহার্য ৬ রসের (কটু, অম্ল, লবণ, কষায়, তিক্ত ও স্বাদু) মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৪ + ৬ = ২০।

যখন এই বিংশতি উপাদান মূত্রমার্গে ক্ষয় হয়, তখনই বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং বিংশতি প্রকার মেহ নিছক কল্পনা নয়, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে সদৃশ বস্তুর সাহায্যে অসদৃশ বস্তুর পরিচয় কপিলের সাংখ্যদর্শনে উপমিতি জ্ঞান নামে বর্ণিত হয়েছে। আয়ুর্বেদদর্শন রোগের নামাকরণে এই উপমিতি জ্ঞানের সাহচর্য অবলম্বন করেছে, যথা—উদক বা জল সকলের পরিচিত অর্থাৎ সদৃশ বস্তু। উদকমেহ অসদৃশ বস্তু। যে মেহরোগে উদক সদৃশ মূত্র হয়, সেই রোগকে উদকমেহ বলে। বস্তুত সদৃশ বস্তুর সাহায্যে অসদৃশ বস্তুর বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আয়ুর্বেদ বর্ণিত ভাবধারা দর্শনভিত্তিক এবং সুচিন্তিত এবং যুক্তিবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

চিকিৎসা

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-পদ্ধতির মূলমন্ত্রঃ—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নৈবকার্য্যা বিচারণা
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

(বৃহস্পতি)

সুতরাং কোন ধারাবাহিক চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্ণনা না করে অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং গবেষণালব্ধ কয়েকটি তথ্য নিম্নে পরিবেশ করিতেছি :—

(ক) যে সকল ভেষজ ও ঔষধ রক্তের শর্করা পরিপাক করে এবং অগ্ন্যাশয়কে সহজ সবল ও সচল করে তোলে তাদের বিবরণ—

(১) মেথিশৃঙ্গী পাতা, (২) জামবীজ,

(৩) তেলাকুচা পাতা ও ফল, (৪) বজ্রদুমুর, (৫) কাঁঠাল বীজ, (৬) আম শেওরা পাতা, (৭) উচ্ছের রস, (৮) নারিকেল ফুল, (৯) অড়হর পাতা, (১০) পালঠা মাদার পাতা, (১১) মোচার রস, (১২) কদম ফুল (১৩) নাইন-ও-ক্লক ফুলের পাতার ও ডাটার রস, (১৪) স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, তাম্র।

(খ) যে সকল ভস্ম বা ভেষজ যকৃতকে সহজ সরল ও সচল করে তোলে তাদের উল্লেখ—

(১) নিমপাতা, (২) ক্ষেত পাপড়া, (৩) জয়ন্তী পাতা, (৪) চিতা, (৫) আর্কনাদি, (৬) ছাতিম, (৭) বৈক্রান্ত, (৮) কান্ত লৌহ, মুক্তা লৌহ, স্বর্পর।

(গ) যে সকল ভস্ম বা ভেষজ মূত্রযন্ত্রকে সহজ সরল ও সচল করে তোলে, যেমন—

(১) পাথরকুচি পাতা, (২) তৃণপঞ্চ মূল, (৩) গোক্ষুর, (৪) পুণর্নবা, (৫) কুলেখাড়া, (৬) ছোলার জল, (৭) স্বর্ণমাক্ষিক, বঙ্গ, মনঃশীলা, সোহাগার খৈ, শিলাজতু।

(ঘ) চিকিৎসকেরা যে সমস্ত আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধ সচরাচর ব্যবহার করেন, যেমন—

(১) নবায়স লৌহ, (২) বৃহদ্বাত্য লৌহ, (৩) বসন্তকুসুমাকর রস, (৪) বৃঃ সোমনাথ রস, (৫) মেহবজ্র, (৬) বৃঃ বঙ্গেশ্বর রস, (৭) মেহনাদ রস, (৮) অপূর্বমালিনী, (৯) মেহমুদ্গর, (১০) চন্দনাসব, (১১) গোধূমাদ্যঘৃত প্রভৃতি।

Synthetic medicine রোগের উপকার না করলেও দেহের ক্ষতি সাধন করে না। সেইহেতু আয়ুর্বেদ বর্ণিত ঔষধকে Synthetic medicine বলা যায়। আমরা উপরের "ঘ" বিভাগে বর্ণিত ঔষধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখব ঐ ঔষধগুলিতে উপরে বর্ণিত "ক" "খ" "গ" বিভাগে বর্ণিত ভেষজ এবং ভস্মের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। আবার "ক" "খ" এবং "গ" বিভাগ যথাক্রমে অগ্ন্যাশয়, যকৃত এবং মূত্রযন্ত্রকে সহজ, সরল ও সচল করে। এই বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের বর্ণিত বহুমূত্র চিকিৎসা অগ্ন্যাশয়, যকৃত এবং মূত্রযন্ত্রভিত্তিক চিকিৎসা। পশ্চিমী চিকিৎসা-পদ্ধতি সর্বপ্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ভাববারায় পুষ্ট। সুতরাং পশ্চিমী শিক্ষাপদ্ধতি (allopathic) বহুমূত্র চিকিৎসায় নূতন কিছু করে নাই। তাহাদের প্রচেষ্টাকে বলা যেতে পারে "An attempt to put old wine in a new bottle"।

পথ্যাপথ্য

(১) ভাত যতটা কম খাওয়া যায়। ভাতের পরিবর্তে মাত্রামত ছানা, তরকারি বিধেয়। পাকা ও কাঁচা বজ্রদুমুর পুটলীবদ্ধ অবস্থায় ভাতের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই ভাত ব্যবহার সুফলদায়ক।

(২) ছানার ডালনা, বজ্রদুমুরের ঝোল, আটির পালো, মোচার তরকারি, থোরের রস, উচ্ছে, কাঁঠাল বীজ প্রভৃতির তরকারি, তেলাকুচোর সুক্তো সুপথ্য।

(৩) মর্তমান বা বিচেকলা চাল ভাজার গুড়ার সহিত মিশ্রিত করে সেবন বাঞ্ছনীয়।

(৪) পেঁপে, ঝিঙ্গে, পটল প্রভৃতি তরকারি সুপথ্য।

(৫) ঝাল, টক, শাক ও মিষ্টি যতটা বর্জন করা যায় ততই মঙ্গল।

---

* আগামী ২২শে আষাঢ়, ১৩৭৪। ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড-কলিকাতায় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের কায়চিকিৎসা বিভাগের অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত হবে। মধুমেহ রোগের আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুত্ব বুঝে তাকারীর কিছুটা উল্লেখ কোন কোন স্থলে সমীচীন হতে পারে এবং তাহা আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ দেখাবার জন্য কিন্তু তাকারীর বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। এ বিষয়ে মাননীয় লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। —প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আরোগ্যশালায় চিকিৎসা*

কবিরাজ শ্রীসূর্যকান্ত রায়, তত্ত্বাবধায়ক, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়

আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালার তুলনায় পাশ্চাত্য চিকিৎসায় যদি ধরা যায় ৬০০০ শয্যা থাকে তবে শত করা ৫% আয়ুর্বেদের শয্যা আছে। ইহা খুবই কম। নিম্নলিখিত ৩০০ শয্যার মধ্যেও দেখা যায় বহু শয্যা খালি যায় অর্থাৎ গড়ে শতকরা ৫০টী শয্যা ভর্তি থাকে। এই যে শতকরা ৫০টী বেড খালি যায় তাহা পূরণ না হওয়া অবধি নূতন শয্যা বৃদ্ধির প্রশ্নই আসে না। এই যে শয্যা খালি যায় তাহার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। মনে হয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় যে ধারা বা পদ্ধতি তাহা সাধারণ লোকের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে—তাহা দূরীকরণের বিশেষ প্রয়োজন। সেই হিসাবে অনুপানের বাহুল্য আনুষঙ্গিক আচারবিধি, সহজসাধ্য ঔষধের প্রচলন ইত্যাদি বাঞ্ছনীয়। প্রায়ই দেখা যায়, আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালায় যে সকল রোগের চিকিৎসায় ফললাভ হবে না সে-সকল রোগী সুপারিশে ভর্তি হইয়া যান কিন্তু পরবর্তী কালে সেই সমস্ত রোগীর রোগ অসাধ্য হওয়ায় দীর্ঘদিন যাবত হাসপাতালের শয্যা অধিকার করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, অথবা বিদায়কালে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় কোন কাজ হয় না বলিয়া রোগী অথবা রোগীর অভিভাবক বদনাম করেন। সেইজন্য রোগী ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট রোগ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ফলপ্রদ হইবে কিনা সেই বিষয়ে বিবেচনার বিশেষ প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সহজসাধ্য, সহজলভ্য ও সহজসেব্য ঔষধ প্রস্তুতের প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালগুলি পাশ্চাত্য হাসপাতালের তুলনায় অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন। সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ সময় দেখা যায় প্রলেপ বা তৈল মর্দনের ফলে রোগীর শয্যা অপরিষ্কার থাকেন

আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালের সুশ্রূষাকারিণীর আয়ুর্বেদীয় ঔষধাবলির উপকরণ, গুণাগুণ ও প্রয়োগ পদ্ধতির বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

এমন অনেক সময় দেখা যায়, আরোগ্যশালার পরিদর্শক চিকিৎসকগণ নানা কারণে ওয়ার্ড পরিদর্শন নিয়মিতভাবে করেন না। তাহাতে রোগীর মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যে তাহাকে চিকিৎসক বোধহয় ভালভাবে দেখিতেছেন না। এই অবস্থা দূরীকরণের প্রয়োজন।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার জন্য শয্যাসংখ্যা তামলাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ—৭৬

যামিনী ভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ—১৩৪

বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়—৩০

বিশুদ্ধানন্দ যাবোয়ারী হাসপাতাল—৭৮

---

*আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৪তম বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতা—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে বুধবার ১০ই মাঘ, ১৩৭০ সালে অনুষ্ঠিত 'মনোবিজ্ঞান'-শাখা বিভাগে লেখক কর্তৃক পঠিত—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

॥ সঞ্চয়ে সুখ ও সমৃদ্ধি ॥

আপনার টাকা এগুলিতে লগ্নী করুন ঃ

জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট
জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট
পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

ক্রমবর্ধমান নিদিষ্ট মেয়াদী আমানত পরিকল্প

বিস্তারিত বিবরণের জন্য খোঁজ করুনঃ

ডাকঘরসমূহ, স্বল্প সঞ্চয় অধিকার, রাইটার্স বিল্ডিস্, কলিকাতা-১
এবং আঞ্চলিক জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা, হিন্দুস্থান বিল্ডিস্, কলিকাতা-১৩

জব্লিউ, বি. আই এড পি. আর (এড ডিস্ট্রি ১৩২৯১) ৬৬

A revolution in Ayurvedic Medicine...

Baidyanath **medicines are Manufactured in 5 big Rasayanshalas by Ras-Shastries (Chemists) and for their effectiveness enjoy the confidence of the Medical profession all over the country and abroad.**

Baidyanath **medicines are a symbol of Revolution in the world of Indian Medicine.**

SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN PRIVATE LTD. CALCUTTA

SHREE

Baidyanath

AYURVED BHAWAN

PRIVATE LTD.

LEADING MANUFACTURERS OF AYURVEDIC AND PATENT MEDICINES

CALCUTTA · PATNA · JHANSI · NAGPUR · ALLAHABAD

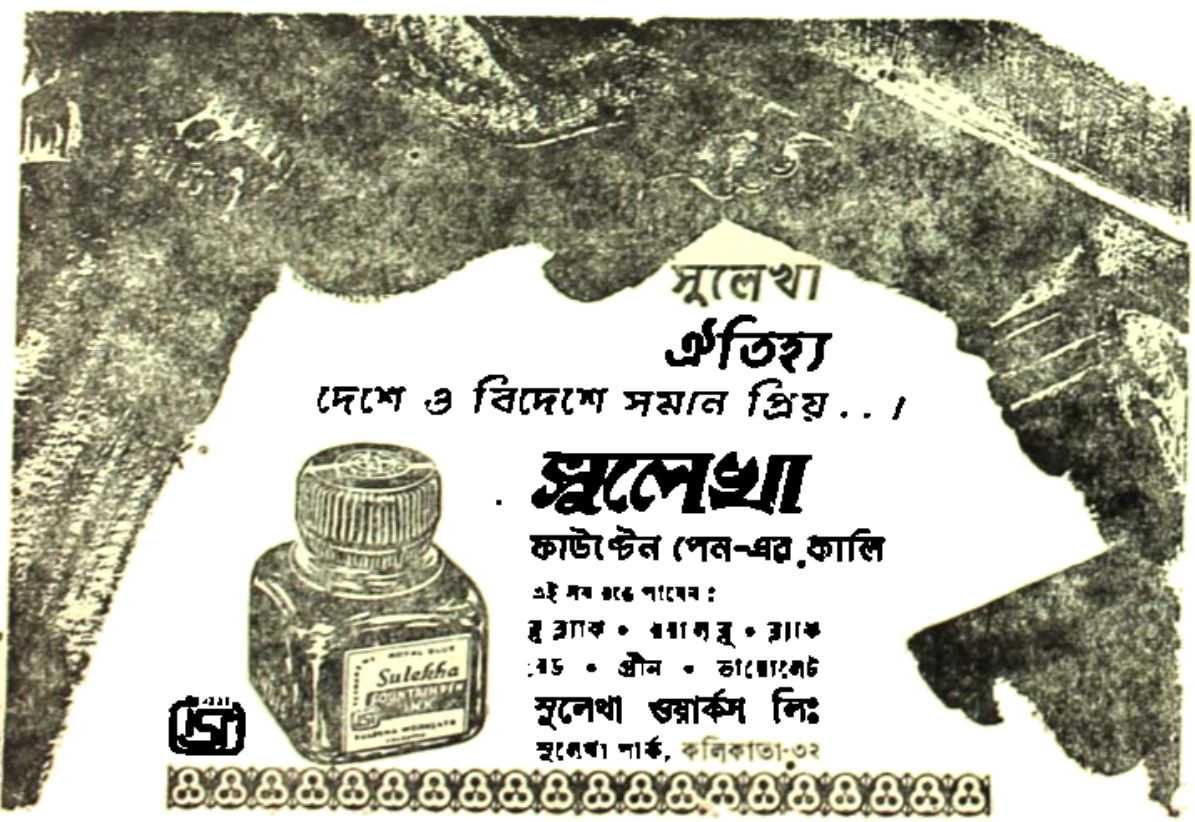

Photocomposed/SW-22 B

The 'Ayurveda-Bharati' is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Patuatola Lane, Calcutta-9 and

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ. আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়—৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতিসংখ্যা ৭৫ প. ৭ম বর্ষ—শ্রাবণ—মাঘ, ১৩৭৪ বার্ষিক—সডাক ৪৲ টাকা মাত্র

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'—সূচীপত্র, শ্রাবণ-মাঘ, ১৩৭৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। মানবমহলী গতি (গল্প)	শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার	৩৩
২। সম্পাদকীয়		৩৪
৩। The Principle of Ayurveda—A Synthesis	Ayurvedacharya Bagala Kumar Majumdar	৩৭
৪। আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে পথ্য-গবেষণা	কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ	৪১
৫। কামলা রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদীয় গাছের গুণাগুণ	কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার	৪৫
৬। জনস্বাস্থ্যে ঔষধের স্থান	কবিরাজ শ্রীমনোরঞ্জন সাংখ্যতীর্থ	৪৮
৭। সংক্ষিপ্ত বসন্ত চিকিৎসা ও বিবিধ মুষ্টিযোগ	পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাশ শর্মা	৫০
৮। রসবিজ্ঞান	কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন	৫২
৯। আয়ুর্বেদে কায়চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন	৫৫
১০। কবিরাজকুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন (জীবনী)	কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন	৫৮
১১। আয়ুর্বেদমতে মূত্রপরীক্ষা-পদ্ধতি	কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়	৬১
১২। শিশুপালন বিষয়ে প্রবন্ধ	কবিরাজ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৬২
১৩। মনের উত্তেজনা ও তাহার প্রতিকার—	পণ্ডিত শ্রীকল্পদ মুখোপাধ্যায়	৬৪
১৪। অগদতন্ত্র	কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর	৬৭
১৫। Research in Ayurveda	Kaviraj Pravakar Chattopadhyaya	৭৩
১৬। যুক্তিরত্নমালা	প্রাণাচার্য	৭৭
১৭। রসায়নী বিদ্যা	কবিরাজ শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৭৮
১৮। বিচিত্র প্রসঙ্গ		৮০

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক ২য়—৪র্থ সংখ্যা | শ্রাবণ—মাঘ, ১৩৭৪ Aug.—Feb.—1967-68 | ৭ম বর্ষ Vol. VII. NoS. 2-4

মানবদরদী গর্কি

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

(১৯৬৮-২৯শে এপ্রিল জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে)

মৃত্তিকার অন্ধ ভেদি বাড়ে বীজ মহীরুহে
আপন গৌরবে—নাহি মানে বাধা, নাহি সহে
প্রতিরোধ। তুমিও তেমতি হে বিশ্বদরদী
ক্ষুদ্র ঘরে ক্ষুদ্রের লাগি কত কৃচ্ছ্রতা সাধি
মূকেরে দিলে ভাষা দৈন্যে দিলে আশার বাণী—
তুচ্ছ যারা দলিত তাদেরো নিলে বক্ষে টানি
নিঃস্বার্থ আবেগে। কী যাতনা পায় মাতাপিতা
সন্তানের তরে—নাহি অন্ন নাহি বস্ত্র বৃথা
সংসার হাহাকার। নির্যাতিতের বন্ধু তুমি
সহিতে পারনি কভু পরের বেদনা জানি—
কোন দেশ কোন জাতি বর্ণ ভুলেছ আক্রোশে
নিখিল ক্রন্দনে জীবন-বিসর্জনে নিঃশেষে।
লেখনী তব করুণার স্নিগ্ধ ধারা অম্লান
জনচিত্ত করিল উদ্বেল, দুর্ভাগ্যে সম্মান,
বঞ্চিত জীর্ণদেহে করিল প্রাণের সঞ্চার,
অনাদৃতে দিল ভালবাসা—খসিল ধনীর
বজ্রমুষ্টি—টুটিল অভুক্তের লৌহশৃঙ্খল—
তুমি ছিলে মরুমাঝারে ফল্গুধারা রসাল
শ্যামলি নিলে শুষ্ক ধরণী ক্ষুব্ধিত পাষাণ,
পথভ্রান্তে হে নির্ভীক চির মুক্তির সন্ধান—
দেশে দেশে স্বজন তোমার দেশে দেশে প্রীতি
নিষ্পীড়িতের চির-মর্মী—অক্ষয় তব স্মৃতি।

সম্পাদকীয়

কোন যুগে পথ চলেছে বিচিত্র প্রকাশের সমারোহে। কত দিকে তার গতি প্রগতি-তার হিসেব নেই। পথপ্রান্তে দু'একটা বট গাছ হয়ত থেকে যায় তার নিশানার নির্দেশ দেবার জন্য—অগণিত সৃষ্টির সুমেরু-কুমেরু অজানাতুহিনে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু নবযৌবনা ধরিত্রীর নব নব উন্মেষ পুরাতনের জড়তা ভেঙে নিরবচ্ছিন্ন সজীবতার মালঞ্চে চির-প্রস্ফুটিত। সেখানে তার বিশ্রাম নেই ক্লান্তি নেই, চলাই তার কাজ—কোথাও সবুজের হাট, কোথাও বিচিত্রবর্ণ ফুলের কুঞ্জবন, কোথাও সুবাসের স্বচ্ছল তরঙ্গ, কোথাও পাখির কাকলি, কোথাও মরুভূমি—আবার কোথাও সাগরের গর্জন, তটিনীর সুমধুর কল্লোল, কোথাও শৈলশ্রেণীর গাম্ভীর্য সৌন্দর্যের নিকেতন শ্রাবণের ধারায় মুহ্যমান। আয়ুর্বেদ-ভারতীর জন্মলগ্ন এখানেই—ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের চলার পথে তার প্রকাশ পূর্বাপর মনীষার প্রতীক-ঋষির তপস্যার অঞ্জলি নিরবচ্ছিন্ন গতি জ্ঞানমুষার চাবিকাঠি—লৌকিক হিসেবের খাতায় তার সপ্তম বর্ষের সাধনার পদক্ষেপ।

সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে বিচিত্র গতির সঙ্গম-বিবিধ চিন্তাধারায় ঐশ্বর্যের পরিমণ্ডল একটা জীবন্ত অনুসন্ধান ও অনুভূতির আকর। প্রকৃতি যেমন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সৃষ্টি করে যাচ্ছে—তার ফল কি হবে তার ধার ধারে না মানুষও তেমন তার চিত্তবৃত্তির বহুমুখী প্রেরণায় আপাতরম্য ও আপাত-ফলপ্রসূ সৃষ্টি করে চলেছে সত্য, শাশ্বত সত্যের সিংহদ্বারে পৌঁছতে পারে না—তাই তার এত প্রমাদ এত বিকৃতনা-সৃষ্টির নামে কল্যাণের নামে বিনাশের ফাঁদে আটকে পড়ে। মানুষ প্রকৃতির অন্ধ-অন্ধ প্রকৃতির মত তার কর্মাবলীও নিজের মনগড়া প্রয়োজনের সত্যের ছাঁচে অনর্থট শেষ পর্যন্ত আনে—'ভগবিত্তায়' সেটা হয় না, তাই সর্বত্র গণ্ডগোল মিথ্যা আচরণ ও মিথ্যা পরিণতি। মৌলিক সত্যকে বাদ দিয়ে যেখানে আপেক্ষিক সত্যের উল্লাস ও আনন্দ কামনা করে সেখানে সৃষ্টির আত্মতৃপ্তি হতে পারে—সাময়িক সুখের সম্ভোগ রূপায়িত হতে পারে আসল রূপের মধ্যে যে স্বার্থ-ত্যাগ, সমতা ও সংযমের নীতি অন্তর্নিহিত আছে তার স্পর্শও পেতে পারে না। তাতেই দ্বন্দ্ব ও মতবিভিন্নতার টানাটানিতে ভারসাম্যের যোকাই বাড়ে—বহু প্রতীক্ষিত সাধনার বস্তু শান্তি দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়।

মূল সত্যের সন্ধান নেই বলে কি জেনেও বিজ্ঞানের আকর্ষণে ভোগ ও দুর্ভোগের আতিশয্যে বিভিন্ন পথের পথিক চলেছে বিভিন্ন পথে? বিচিত্রই সত্য না একই সত্য কিন্তু এই বৈচিত্র্য আছে বলে অনৈক্যই বেশি দানা বাঁধছে, সৃষ্টিও হচ্ছে। বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য সাধনের মত আয়ুর্বেদের মৌলিক নীতি সমতা রক্ষা করা—তার সকল নীতি সেই দিকেই প্রসারিত। এটা প্রকৃতিতে যেমন দেহপ্রকৃতিতেও তেমন। তাই দৈহিক কি মানসিক সমস্ত ব্যাপারে সমতা রক্ষার নীতির মূলে ত্রিদোষ, ত্রিগুণ, ত্রিযোগ দোষ-ধাতু-মল বিজ্ঞান প্রভৃতি। ওষধি ধাতু-

বিশ্লেষণে, ঔষধ প্রস্তুতকরণে, শারীরতত্ত্ব, রোগনির্ণয়ে সর্বক্ষেত্রে একই সমবায়ী নীতি অনুসৃত হয়। উপকরণের সুসমবণ্টনে ও সুবিন্যস্ত যোগাযোগে দেহের যে স্বাস্থ্য একটি পত্র বা ফুলের রং ও গন্ধের বেলায়ও অনুরূপ। সুতরাং আয়ুর্বেদের শিক্ষাপদ্ধতি সমবায়ী নীতির সার্থক বিজ্ঞানসম্মত বিচার। ইহা পরীক্ষিত ফলপ্রসূ চিকিৎসানীতি যা এখনও সত্য, পূর্বেও সত্য ছিল—ভবিষ্যতেও সত্য থাকবে। আয়ুর্বেদের বৃদ্ধত্রয়ী, লঘুত্রয়ী বা অন্যান্য গ্রন্থ-রসায়নশাস্ত্র, এমন কি, পশুচিকিৎসাতেও ঐ একই নীতি পরিদৃষ্ট হয়। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের নীতি মূলত ধর্মে, সমাজে, শিল্পেই নয়—দেহ প্রকৃতির মূলে যে সেই নীতি কাজ করছে উহাই আয়ুর্বেদের শাশ্বতবাণী—কালজয়ী স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার মূল সত্য।

অতএব সামিশ্রণের অবৈজ্ঞানিক পথে যে আয়ুর্বেদের পুষ্টিসাধন তা সোনার পাথরবাটি গড়ার মত অসম্ভব ও অবান্তর—ইহা বন্ধ করে দিয়ে প্রকৃত আয়ুর্বেদচর্চার উৎকর্ষের পথে স্নাতকোত্তর আয়ুর্বেদশিক্ষার আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কার্যকরী ও অধিকতর উৎকর্ষের বনিয়াদ সুপ্রতিষ্ঠ করতে পারবে। ডাক্তারী পড়বার জন্য মেডিকেল কলেজ ও ফ্যাকাল্টি আছে। আয়ুর্বেদ কলেজে আয়ুর্বেদের সুষ্ঠু পঠনপাঠন, প্রত্যক্ষজ্ঞান ও অনুশীলনের প্রগতিশীল আয়ুর্বেদীয় নীতি অনুযায়ী আয়োজন তাবৎ বিশিষ্ট ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি সাধন করুক—ইহাই চিন্তাশীল প্রাচ্য চিকিৎসকগণ আশা করেন, এমন কি, পাশ্চাত্যও।

আয়ুর্বেদের গভীর জ্ঞান আয়ত্ত করবার জন্য সংস্কৃতে জ্ঞানসম্পন্ন, দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছাত্রের অভাব ঘটেছে। ফলে আয়ুর্বেদশিক্ষায় যে সাধনা ও অভিনিবেশ দরকার তার স্থলে বর্তমানে কলেজী শিক্ষার আপাতমর্যাদা ও অনায়ুর্বেদীয় শিক্ষার প্রাধান্য ও প্রাদুর্ভাবে পূর্বের মত প্রতিভাসম্পন্ন করিৎকর্মা নিপুণ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক আর বাহির হচ্ছে না। এই অশুভ স্রোত বন্ধ করতে হবে—পত্তন করতে হবে আয়ুর্বেদের সামগ্রিক সুশিক্ষা ও সুবিন্যস্ত ফলপ্রদ চিকিৎসাপদ্ধতি আর প্রসারিত করে দিতে হবে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে কবিরাজদের জীবিকার্জনের উপায়। আয়ুর্বেদের প্রসার ও উন্নতির জন্য লোক কল্যাণে যে দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কথা ছিল তাহাও আজ উপেক্ষিত। আয়ুর্বেদের প্রতি এই অন্যায় ও অশোভন সরকারী ব্যবহারের প্রতিকার করতে হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে যে আয়ুর্বেদ-ফ্যাকাল্টি স্থাপন করবার আয়োজন চলছে—কি হবে না হবে এখনও নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না—তা হবে নিছক বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার ও অনুশীলনের পীঠস্থান। সুতরাং স্নাতকস্তরে ছাত্ররা রীতিমত সমগ্র আয়ুর্বেদে পারংগম হলেই স্নাতকোত্তর স্তরে প্রবেশ করবার অধিকার এবং যোগ্যতা লাভ করবে। কলেজী শিক্ষায় পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ না করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে প্রবেশ করলে হবে পণ্ডশ্রম ও উদ্দেশ্য ব্যর্থ। আয়ুর্বেদের যদি অঙ্গহানি ঘটে থাকে, তবে তা আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং গবেষণার দ্বারাই সংশোধিত হতে পারে—ডাক্তারী ঔষধ সেবন, ইনজেকশন বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ হতে পারে না, বরং উহার অবলুপ্তিই অনিবার্য হয়ে উঠবে। সুতরাং যারা বিপথগামী স্বার্থ, মর্যাদা

জ্ঞানের বা অজ্ঞতার জন্যই হোক, তারা সাধনা ও সমৃদ্ধির পথে, প্রজ্ঞা ও অনুশীলনের সাহায্যে আয়ুর্বেদের ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতির পুনরুজ্জীবনের মহতী সম্ভাবনা জড়িয়ে ধরুন।

আয়ুর্বেদকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু আয়ুর্বেদের নীতিগত ও পরিভাষাগত করে গ্রহণ করবার কোন বাধা না থাকলেও আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানীদের সমস্ত অঙ্গের যে বিশ্লেষণ, ঔষধ, প্রয়োগবিধি—যান্ত্রিক পদ্ধতি, তার বিভিন্ন নীতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রভৃতি হাতে-কলমে জানা প্রয়োজন কিছু গ্রহণ করবার পূর্বে। আয়ুর্বেদের উন্নতির নামে সর্বস্তরে যে ডাক্তারী গ্রাস কচ্ছে, তা আধুনিক-বিলাসী কবিরাজদের লক্ষ্য করা উচিত। আয়ুর্বেদ-কলেজে যদি ডাক্তারী চালিয়ে আয়ুর্বেদের উন্নতি হচ্ছে বলে চিৎকার করলে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ হয় তবে উহা যত শীঘ্র বন্ধ হয় ততই ভাল। এ সমস্যা ডাক্তারদের নেই, কেন না, তারা যাই করুন না কেন, আধুনিক বিজ্ঞানের নীতিতে গ্রহণ করেন—হোমিওপ্যাথরাও তাদের নীতিতে-চড়ুল বাবায় আধুনিক কবিরাজগণ। তাদের নেই আধুনিকের মৌলিক জ্ঞান—না আছে আয়ুর্বেদে মৌলিক জ্ঞান। ফলে, এক বিজ্ঞান হতে অন্য বিজ্ঞানে নীতিগত করে নেবার ক্ষমতা নেই—হাতে-কলমে তো দূরের কথা, থিওরির দিক দিয়েও নয়। তাদের নতুনকে জানবার উৎসাহ ও উদ্যমকে প্রশংসা করি কিন্তু এক বিজ্ঞানের নামে অন্য বিজ্ঞানের পূজারী হওয়ার অজ্ঞানতাকে আমল দিতে পারি না—এ যেন আত্মা-হত্যার সাধক।

ধর্মে যুক্তিকি চলে—বিজ্ঞানে বিশিষ্ট নীতি অনুসারে বিশিষ্ট ফলের প্রশ্ন আছে। আর এঁদের যদি ডাক্তারীর প্রতি এত শ্রদ্ধা থাকে তবে ডাক্তারী পড়লেই তো পারতেন। আয়ুর্বেদের নামে আয়ুর্বেদ-প্রসারের পথ রুদ্ধ করার কী কারণ আছে? কবিরাজী কলেজে ডাক্তারী পড়ার প্রহসন এ দেশেই চলে—সরকার ও জনসাধারণ তা বরদাস্ত করেন। অন্যদেশে এইরূপ আত্মঘাতী সংমিশ্রণের পাঠ্যতালিকায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানের চিকিৎসাপদ্ধতিকে আড়ষ্ট করতে দিত না। আয়ুর্বেদের স্বার্থে, ছাত্রদের স্বার্থে এম্-এ-এস্-এক্ বন্ধ করে দেওয়া উচিত কিন্তু তা বলে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষের পথ কখনো বন্ধ হবে না। পাঠ্যতালিকা সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদানুগ হবে—অধ্যাপক তুলনামূলকভাবে যেখানে দরকার অন্যায়ুর্বেদকেও আয়ুর্বেদনিষ্ঠ করে তুলবেন—এখানেই সাঙ্গীকরণের প্রশ্ন—সংমিশ্রণে উৎকর্ষের মূলতত্ত্ব।

আজ যখন এতদিন পরে সরকার আয়ুর্বেদের উন্নতির পথে হস্তক্ষেপ কচ্ছেন তখন আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্পন্ন প্রবীণ কবিরাজদের (বয়সের কোন বাধা সেখানে থাকবে না) বিভিন্ন বিষয়ে নিয়োগ করা কর্তব্য। এখানে কোন ব্যক্তিস্বার্থ, বিশেষ কলেজ বা টোলের প্রশ্ন বড় কথা নয়, সমগ্র আয়ুর্বেদশিক্ষার উচ্চমান যাতে আয়ুর্বেদের সামগ্রিক উৎকর্ষের পথ প্রশস্ত করে তার দিকে লক্ষ্য রাখাই হবে প্রধানতম গুণ ও বৈশিষ্ট্য। আশা করি, সরকার ও পাব্লিক্ সার্ভিস্ কমিশন্ এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার চতুর্দিকে বিস্তৃত। পরিণত বয়স হলেও শিশুসুলভ চাপল্য সাধকের চিত্রক্ষেত্র প্রতিনিয়ত আন্দোলিত করছে। তাই এত কাড়াকাড়ি দ্বন্দ্ববিদ্বেষ ধরিত্রীর শান্তির নীড় বিধ্বস্ত কচ্ছে। এই সদাসঙ্কুচিত দুর্লঙ্ঘ্য জ্ঞান-পারাবারের জ্ঞানপিপাসু, আসুন ভারতীয় সংস্কৃতি, বলতে কি, বিশ্বসংস্কৃতির সম্যক্ পরিশীলনে আমরা উদ্যোগী হই।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

The Principle of Ayurveda—A Synthesis in The Science of Medicine

Ayurvedacharya Bagala Kumar Majumdar, M.A.
Founder-President, Ayurveda Bijnan Parishad, Calcutta.

(*Continued from Magh, 1378 B.S.*)

Visag bubhsusur Matimānatah
swagunasampadi ।
Param Prayatnamatisthet Prānadah
syāt yathā ntnam ॥
(C—Su—1—61)

The intelligent physician desirous of acquiring proficiency in treatment, should so much take care to improve deeply his wealth of knowledge to give life to mankind.

After describing the analysis of drugs in different ways, it is now a massive task to find out their effects both chemical & mechanical upon the body in health and disease singly or collectively as the case may be, according to requirement. The onerous and intricate method of experimentation to find out the cumulative effect and the resultant force reacting upon the body for coping with the attacks of diseases veers round the organic defect of the system and the proposed medicinal effect therein. It appears really a riddle how the particular chain of herbs or metals or both having so varied and multiple properties of different kinds were combined in particular proportions to deal with particular symptoms having at their background internal pathological disorder. The skill and industry in adjusting differences in different aspects of properties was not the only way of research but the different apparatuses for purification, distillation, dissolution etc. were also requisitioned to produce the particular results for curing diseases.

Through incessant application of drugs upon the body and carrying on experiment after experiment in different methods the first research scholars arrived at some sorts of preliminary knowledge of some herbs as antidotes to unknown disorder. It is quite natural that dismayed at the appearance of uncouth symptoms, they travelled in troubled waters invoking gods and goddesses, reciting incantations and prescribing amulets sometimes with medicines—herbs or metals. In this way the tedious ordeal began when they gradually realised the causes and effects of diseases and their remedies to some extent. Some hints of their persistent attempts in the remnants of the processes are found in the Rk Veda first

and then in other Vedas, particularly Atharvaveda of which Ayurveda is an upanga. In course of time knowledge of the body, herbs and metals with the cycle of seasons, resulting in seasonal rules and regulations of health, gave them a glimpse of the mine of wisdom that inheres in them. Gradually studies and research went on side by side ultimately building up the edifice of such a great science of Ayurveda offering relief to the erstwhile dumb millions. It is not known when life began. But surely with the advent of human beings on earth, science of treatment too set in. The process of progress as written in old treatises of Charaka and Susruta etc. started with Brahman who compiled a treatise of one lakh verses divided into a thousand chapters.

But men being short-lived and lagging in intellectual ability, he divided it into eight departments viz, Kāya-chikitsā, Salya, Sālākya, Agadatantra, Koumāravrtya, Bhutavidyā, Rasāyana and Vājikarana. The agelong experiments as manifest in the tremendous development of Ayurveda and its checkered branches of analytic and synthetic cataclysm, were the forerunners of a process which marked the age of Vedas in the analysis of different seasons. organs, tissues,—their internal working, and outward symptoms in health and disorder vis-a-vis discovery of Tridoshas, three Gunas, three Yogas, twenty Gunas, six Rasas, their properties and actions—the Rasa-Virya-Vipāka-Prabhāva theory of herbs and metals etc. The Pancha-Mahatbhutas and the Pancha Tan-matras etc. as basic ingredients of matters expressed in the creation of the world, constitute an unfathomed mine of knowledge that the ancients had discovered to march forward towards finer and finer transformation through progressive research and scientific precision.

The volume of work as manifest in thousands of books of theoretical and practical scholarship, herbal and metallic preparations of various chemical methods in the process of purification, incineration, killing and compounding by different instruments etc., strikes most acutely to the scientific genius of the Indians of those days. They are in no way inferior in spirit and effect to the present day scientific process though instruments of finer types are available now. Added to this are the checkered numbers of apparatuses to purify, to resolve, to distill etc. and the process of Putapakas in different methods for chemical and mechanical combination to create conditions of particular effects and the methods of purification, incineration etc for metals to make them suitable for assimilation in the

body in health and disorder. Vābana which is a fine device not known to other sciences of health for multiplying quality and resetting of particles or molecules for further chemical adjustment, is also adopted.

Compated with the theory of Bacteriology as the main plank for treatment in Allopathy and the theory of "Simili Similibus Curantum" in Homœopathy, the Tridosha theory in Ayurveda has opened up a new angle of vision in the system of diagnosis and science of the preparation of medicine with all its ramifications in different lines to bring about a synthetic effect or in other words, to create equilibrium in the body with synthetic medicines. The perspective of a medicine penetrates into the basic properties of different herbs and metals to produce certain results inside the body to counteract the attack of diseases as a result of the imbalance of Tridoshas for bringing about an adjustment of the different forces and not to control one at the cost of others predominating. Thousands of medicines strike at this principle basically. So Ayurvedic Treatment is both easy and effective if diagnosed and prescribed in the light of the Dosha-Dhatu-Mala-Theory, spreading into various achievements of scientific values centuries before modern science had seen the light of knowledge.

Some Technical terms expressive of qualities of Drugs :

(1) Dipana—Drugs that do not help digestion but raise the digestive power e.g., Sulfa, Mouri etc.

(2) Pāchana—Drugs that digest mucus but do not create digestive power as Nagakesar etc.

(3) Śamana—Drugs that do not push out the blemishes (as Bata, Pitta & Kafa etc.) nor increase the well-balanced Doshas but equalise the disordered Doshas.

(4) Anulomana—Drugs that digest the undigested Malas (Bayu, Pitta & Kafa etc.) and purge the constipated mala out as Haritaki.

(5) Sransana—Drugs that purge out the undigested malas i.e. Bayu, Pitta etc without digestion as Sondal etc.

(6) Vedana—Drugs that push out the loose, constipated or dried-up faecus as Katki etc.

(7) Rechana—Drugs that throw out the digested or undigested malas breaking through the mass as Teuri etc.

(8) Bamana—Drugs that push out the undigested Pitta & Kafa or food forcefully as Maynafal etc.

(9) Sanśodhana—Drugs that push out the accumulated Mala (faecus) through the mouth or the rectum, as Ghoshafal etc.

(10) Grahi—Drugs that dry up the watery faecus for having properties of

digestion, digestive power and heat as Sunthi, Jirā & Gajapipul etc.

(11) Stambhana—Drugs that control upwards the malas for rudeness, coolness, astringence and lightness as Indrayaba, Sonagach etc.

(12) Chhedana—Drugs that uproot the doshas like Kafa forcefully as Kshāra, Maricha, Silajatu etc.

(13) Lekhana—Those that dry up & emaciate tissues & malas as honey, warm water, bacha, indrayaba etc.

(14) Bājikarana—Those that help intercourse as aśvagandha, śatamuli, sugar, musali, śālmuli etc.

(15) Sukrala—Those that increase semen as Gorakshachakule, Alakushibija etc.

(16) Rasāyana—Those that destroy old age & diseases like Haritaki, Guggulu, Silājata etc.

(17) Byabayi—Drugs that at once spread throughout the body after being taken as opium, Siddhi etc.

(18) Vikashi—Drugs that separate the body from ojadhatu & loosen the body as bettlenut, Kedodhānya etc.

(19) Madakāri—Drugs that make men devoid of intelligence as wine, surā etc.

(20) Pramāthi—Drugs that control the accumulation of Bāta, Pitta, Kafa etc. through their own strength as Maricha, Bacha etc.

(21) Abhisyandi—Drugs that obstruct the channels and increase the weight of the body through their properties of slipperiness and heaviness as curd etc.

(22) Vidāhi—Drugs that cause vomiting, thirst and burning sensation of the heart and take time for digestion as Bansānkura, baked food etc.

(23) Yogabahi—Drugs that absorb the properties of all things boiled with them as clarified butter, oil, mercury, honey, water, iron etc.

(To be continued)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিষয়ের অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন, এম, বি, কবিভূষণ ও কবিরত্ন এবং কবিরাজ শ্রীনন্দন কুমার সেন, আয়ুর্বেদতীর্থ, এম-এ-এস-এফ পরিচালিত

শ্রীগোপাল আয়ুর্বেদ ভবন (রেজিষ্টার্ড)

৪৭নং চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ ও

১২এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। ফোন নম্বর—৪৭-২৬২২

যঃ মৃঃ আশীবিষনাশন—অনিদ্রা, কারণহীন দুশ্চিন্তা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির অব্যর্থ মহৌষধ—মূল্য প্রতি শিশি ১·১০ অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধাদি ও জটিল রোগসমূহ চিকিৎসার বিশ্বস্ত ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান।

আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে পথ্য-গবেষণা

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ কাব্যতীর্থ,
অধ্যাপক, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ কলেজ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৩৭৩এর কার্তিক সংখ্যা আয়ুর্বেদ-ভারতীতে দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য, বিপাক ও প্রভাব সম্বন্ধে আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি। এখন উহাদের একটি ধারাবাহিক বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা আয়ুর্বেদীয় নিয়মানুসারে দ্রব্যের গবেষণা কি, কি ভাবে সুরু হইয়াছে, সে-বিষয়ে একটি রূপ দিতে চেষ্টা করিব। কারণ আজ কাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও আয়ুর্বেদ পড়া-শুনা না করিয়াই বলেন—আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পুস্তক দরকার। বিজ্ঞান অর্থে কি বুঝায় নিজেদেরই তাহা জানা না থাকায় পাশ্চাত্য মুক্তবীয়ানার ঢঙে কবিরাজদের মোড়লিজনিত সুখানন্দ উপভোগ করিতে গিয়া অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রস লইয়াই আরম্ভ করা যাক্। আয়ুর্বেদে রস প্রধানত তিনটি রূপে তিনটি নামে তিন প্রকার দ্রব্য-সম্বন্ধীয় পর্যায়ক্রমে ব্যক্ত হইয়াছে। রসনার আস্বাদন হইতে দ্রব্যের স্বাদের তারতম্য অনুসারে এই ছয়টি রসের এক দ্রব্যের নির্যাস বা নিঙড়াইয়া রস নিষ্কাশন দ্বারা একটি প্রকাশ আহার হইতে—দ্বিতীয়ত শরীরস্থ সপ্ত ধাতুর প্রথম পরিণত বস্তুটিকেও রস নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

'রস্যতে ইতি রসঃ', তে চ ষট্ বিধাঃ' আবার পারদকে রস বলা হইয়াছে। স্বাদের রস ছয়টি, যেমন—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, কষায়—ঔষধের অনুপান পাচনের জন্য সদ্য রস। আহারজাত প্রথম রস সপ্ত ধাতুর প্রথম ধাতু রস। দেখা যাইতেছে, আয়ুর্বেদে রস শব্দটি স্বাদ গুণ ধাতু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে ধাতুর কথা, সেখানে রসকে আদিরসএবং পঞ্চরস বলা হইয়াছে।

বিমানস্থানে চরক বলিয়াছেন- যে ভিষক রসাদির পরিমাণজ্ঞ নহেন, তিনি ব্যাধি শান্তি করিতে সমর্থ নন। অতএব, হে অগ্নিবেশ, রসাদির পরিমাণজ্ঞানার্থ বিমানস্থানে উপদেশ দিব। তন্মধ্যে প্রথমে রস, দ্রব্য, দোষ, বিকার ও প্রভাব বর্ণনা করিব। রস শব্দে রসবান দ্রব্য বুঝিতে হইবে। এই মধুরাদি ষড়বিধ রস যথাবিধি প্রযোজিত হইলে শরীর দোষ রক্ষা করে—অযথাবিধি প্রযুক্ত হইলে বাতাদি দোষের প্রকোপ জন্মায়। দোষ তিনটি, যথা—বাত, পিত্ত ও কফ। এই দোষত্রয় প্রকৃতিস্থ হইলে শরীরের উপকারক হয়—বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে নানাবিধ রোগদ্বারা শরীর উপতাপিত করে।

রস বিশ্লেষণ-পদ্ধতি

চরকের সূঃ-২৬শ অধ্যায়ে চরক বলিতেছেন—"পার্থিবাদি দ্রব্যসমূহ সদ্গুণবিশিষ্ট, পাঞ্চভৌতিক দেহও তদ্গুণবিশিষ্ট। অতএব জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা তদ্ তদ্যুক্তি ও তত্তৎ প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া ঔষধীভূত না হইতে পারে।" এই ছয়টি রসের মিশ্রণে বা যৌগিক প্রয়োগে তেষট্টি প্রকার রসের উদ্ভব হয়। ইহা ছাড়া আরও

অসংখ্য রসের উদ্‌ভাবনা হইতে পারে ; কারণ এই ভাবে মিশ্রিত রসের পরিসীমা নাই। রস অনন্ত এই কথা শুধু মহামতি চরক বলিয়াছেন, তাহা নয় ; বাগ্‌ভট সুশ্রুত ভাবমিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্বেদ-গবেষকগণ সকলেই তাহাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রত্যক্ষ অনুমান যুক্তিবাদাশ্রয় দ্বারাও গভীর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

চরকের গবেষণা পদ্ধতি ও রীতি—

দ্রব্যসমূহ উহা পথ্যদ্রব্যই হউক বা ভেষজদ্রব্যই হউক, উহাদের নিজস্ব শক্তি দেশ-প্রভাব ও কাল-প্রভাব এই তিনটি অবস্থাভেদে মধুরাদি ছয়টি রসের ৬০ প্রকার মিশ্ররসের বিশ্লেষণ করিয়াছেন অগ্নিবেশ। তাহার উপর চরক সংস্কার সাধন করিয়া নিম্ন ধারায় গবেষণা করিয়াছেন। দ্রব্যের মধ্যে যে গুণশক্তি আছে, যেমন সোমগুণবহুল দ্রব্য হইতে মধুর রসের উৎপত্তি হয়। রসাল ফল—পাকা আম, আনারস, ডালিম, বেদানা সোমগুণ বহুল—ইহারা দ্রব্যে প্রধানতঃ মধুর রসের উৎপত্তির হেতু।

দ্রব্য প্রভাবে রস	দেশপ্রভাবে রস	কালপ্রভাবে রস
মধুর রস	উত্তর প্রদেশের	কচি আম-কষায় রস,
জাঙ্গল-মধু ইক্ষু।	আম, দ্রাক্ষা, দাড়িম মধুর রসবহুল— কৃমির তারতম্যানুসারে উহাই টক্ রসবহুল হয়।	তরুণ অবস্থায় অম্লরস, পক্কাবস্থায় মধুর রস।

কালের মধ্যে আবার ঋতুভেদে রসের তারতম্য হয়—যেমন হেমন্ত কালে ওষধি মধুর রস, বর্ষা কালের ওষধি অম্লরস ও লবণ রসবহুল হয়। শরৎ শীত বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে দ্রব্য কষায়, কটু, তিক্তরসবহুল গুণ। এখানে সংখ্যাতত্ত্বের দিকটি দেখানো হইয়াছে। ছয়টি রস যৌগিক-মিশ্র প্রয়োগে কিভাবে ৬০টি প্রকার হইতে পারে, তাহাই দেখানো যাইতেছে।

আগেই বলা হইয়াছে রস ছয়টি—মধুর (১), অম্ল (২), লবণ (৩), কটু (৪), তিক্ত (৫) ও কষায় (৬)। মধুর রস বাকী পাঁচটি রসের সহিত মিশিয়া পাঁচটি নূতন মিশ্ররস তৈরী করে :

১। মধুরাম্ল	১। অম্ল লবণ	১। লবণ কটু	১। কটু তিক্ত	১। তিক্ত কষায়।
২। মধুর লবণ	২। অম্ল কটু	২। লবণতিক্ত	২। কটু কষায়।	=মোট—১৫।
৩। মধুর কটু	৩। অম্লতিক্ত	৩। লবণকষায়		
৪। মধুর তিক্ত	৪। অম্লকষায়			
৫। মধুর কষায়				

ছয় রসের দুই দুইটি রসের মিশ্রণে উক্ত পনরটি মিশ্ররসের উৎপত্তি হয়। আবার দুই দুইটি রসের সহিত একটি রস মিশ্রিত হইলে কুড়ি প্রকার মিশ্ররস জন্মে যেমন—

১। মধুরাম্ল লবণ	১। মধুর লবণকটু	১। মধুর কটু তিক্ত	১। মধুর তিক্ত কটু
২। মধুর লবণ তিক্ত	২। মধুর লবণতিক্ত	২। মধুরকটু কষায়	
৩। মধুরাম্ল কষায়	৩। মধুর লবণ কষায়		
৪ মধুর কটু			=১০টি নবরস।
১। অম্ল লবণ কটু	১। অম্ল কটু তিক্ত	১। অম্ল তিক্ত কষায়	১। লবণ কটু তিক্ত
২। অম্ল লবণ তিক্ত	২। অম্ল কটু কষায়		২। লবণ কটু কষায়
৩। অম্ল লবণ কষায়			
১। লবণ তিক্ত কষায়।		১। কটুতিক্ত কষায় = ১০টি নবরস।	

সর্বসমেত মিলিত মোট ১০ + ১০ = ২০টি মিশ্রিত রস সৃষ্টি হয়। উল্লিখিত পনরটি নবরস ও কুড়িটি মিশ্রিত হইয়া ১৫ + ২০ = ৩৫টি মিশ্রিত রস হইয়াছে।

আবার চারিটি রসের মিশ্রণে পনর প্রকার মিশ্ররস উৎপন্ন হয়।

১। মধুরাম্ল লবণ কটু	১। মধুরাম্ল কটু তিক্ত
২। মধুরাম্ল লবণ তিক্ত	২। মধুরাম্ল কটু কষায়
৩। মধুরাম্ল লবণ কষায়	৩। মধুরাম্ল তিক্ত কষায় = ৬টি মিলিত রস।

তারপর, মধুর লবণ রসের সহিত কটু প্রভৃতি তিনটি রস পৃথক্‌ভাবে যুক্ত হইলে তিন প্রকার রসভেদ হয়, যথা—

১। মধুরলবণকটুতিক্ত ২। মধুরলবণতিক্ত-কষায়, ৩। মধুরলবণকষায়কটু ৪। মধুর কটুতিক্ত-কষায় = ৪টি মিশ্রিতরস; মোট ৬ + ৪ = ১০টি মিশ্রিত রস।

অম্লরসের সহিত বাকী তিনটি রসের মিশ্রণে ৪টি মিশ্র রস, যথা—

১। অম্ললবণকটুতিক্ত ২। অম্ললবণতিক্ত-কষায় ৩। অম্ললবণকষায়কটু. অম্লকটুরসের সহিত তিক্ত কষায় মিলিত হইয়া এক নব রস সৃষ্টি হয়।

১। অম্লকটুতিক্তকষায়। ১। লবণকটুতিক্ত কষায় = ৩ + ২ = ৫টি; মোট ১০ + ৫ = ১৫টি মিশ্ররস।

আগের পঁয়ত্রিশটি রস এবং উপরি উক্ত পনরটি রসের সংযোগে = ৩৫ + ১৫ = ৫০—মোট পঞ্চাশটি হইল।

পুনরায় ছয়রসের একটি রসকে বাদ দিয়া পাঁচ পাঁচটি রস সংযোগে ছয় প্রকার মিশ্ররস সৃষ্টি হয়,

যেমন, মধুর রস বাদ দিয়া অম্ললবণকটুতিক্ত-কষায় (১) অম্লবাদে মধুরলবণকটুতিক্তকষায় (২), লবণ বাদে মধুরঅম্লকটুতিক্তকষায় (৩), কটুরস বাদে মধুরাম্ললবণ-তিক্তকষায় (৪), তিক্ত বাদে মধুরাম্ললবণকটুকষায় (৫), কষায় বাদে মধুরাম্লকটুতিক্তলবণ (৬)—এই ছয় প্রকার মিশ্ররস এবং পৃথক পৃথক ভাবে ছয়টি রস ছয় প্রকার, যেমন,

মধুর (১), অম্ল (২), লবণ (৩), কটু (৪), তিক্ত (৫), কষায় (৬), মিলিত মোট ৬টি রস=৬+৬=১২টি মিশ্র রস। ছয় রসের মিশ্রণে (১)=১৩—তাহা হইলে পূর্বের ৫০+১৩টি রসের সংযোগে সবসমেত মোট সংখ্যা তেষট্টি হইল।

দুই দুইটি রসের সংযোগে—	১৫	
তিন তিনটি	"	২০
চার চারটি	"	১৫
পাঁচ পাঁচটি	"	৬
একটি স্বতন্ত্র	"	৬
মিলিত ছয়	"	১
		৬৩ মিশ্ররস

এইভাবে জিহ্বার আস্বাদন দ্বারা দ্রব্যের রসানুভূতি বা দ্রব্য মিষ্ট, কি টক্, কি লবণ, কি ঝাল, কি তিক্ত, কি কষায়, এই ছয়টি স্বাদকে মূলভিত্তির মৌলিক উপাদানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া "মধুরাম্ললবণ-কটূতিক্তকষায়কা: ষড়্ রসা: ইত্যভিধায়"।

ইহাদের তেষট্টি প্রকার যৌগিক প্রয়োগ দেখানো হইয়াছে। এখানে স্বাদকে রস নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মিষ্টি, টক্, লবণ, তেতো, ঝাল, কষায় ইহাদের স্বাদ কেমন, খাইতে কেমন লাগে সকলেই তাহা জানে। সেজন্যই রসনার আস্বাদনে দ্রব্য-সম্বন্ধে যে একটি বিশেষ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে রস বলা হইয়াছে, যেমন, মধু মিষ্ট তেঁতুল টক্, বিট্-করকচ-সৈন্ধব লবণ, লঙ্কা-মরিচ ঝালে, হিঙ্কে-পলতা-চিরতা তিক্ত, জাম-বকুল কষায়। এখানে রস, আদার রস, পানের রস, তুলসী পাতা প্রভৃতি লতা-পাতা ফলমূলের রস অর্থে রস ব্যবহৃত হয় নাই। উক্ত ছয়টি স্বাদের জ্ঞান লাভের জন্য ছয়টি স্বাদুরসের গবেষণা করিয়াছেন অগ্নিবেশ-চরকপ্রমুখ প্রাক্তন আয়ুর্বেদ-ঋষিগণ। এই তেষট্টি প্রকার স্বাদুরস হইতে আর বহু প্রকার স্বাদরস সৃষ্টি হইতে পারে এবং ভাবীকালের আয়ুর্বেদ-গবেষণার বিশিষ্ট ধারার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন ঋষিরা। স্বাদুরস আয়ুর্বেদের একটি মৌলিক পদার্থ। ইহারা আমরিক ও অংশাংশ কল্পনায় অনন্তরসের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়—আর্দ্র ও শুষ্কদ্রব্য ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া কিম্বা পিষ্ট-পেষণ সিদ্ধ ক্বাথ কল্কের দ্বারা নিষ্কাষিত তরল বস্তুর নাম রস। ইহার আর এক নাম স্বরস।

তৃতীয়—সপ্তধাতুর তরল ও প্রথম পরিণতি—বস্তুটির নাম রস। ইহা আহারজাত, যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ধন্বন্তরি সুশ্রুত ওজকেও ধাতু নামে অভিহিত করিয়া ধাতু সংখ্যা আটটি বলিয়াছেন।

চতুর্থ—পারদের এক নাম রস। ইহা আয়ুর্বেদ-দ্রষ্টা ঋষিদিগের একটি গবেষণালব্ধ মৌলিক উপাদান। গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, লোহাগা, চুম্বক, স্ফটিক, শঙ্খ, সমুদ্রফেনা, খটিক (খড়িমাটী), গৈরিক (গেরিমাটী), হিরাকস্, খর্পর (ভুঁতের প্রকারভেদ), প্রধানত এই কয়টি উপরস।

উপরস আরও আছে এখানে চৌদ্দটির নাম উল্লেখ করা হইল। ধাতুরসের গবেষণায় নাগার্জুনের দান অপূরণীয়।

ছয়টি মূল রস—মধুরাম্ললবণকটূতিক্তকষায়—ইহারা যাবতীয় খাদ্য পথ্য ও দ্রব্যের মূল উপাদান। ইহারা কোথাও পথ্যাপথ্য দ্রব্যের রোগারম্ভকর এবং রোগ-শান্তিকর ক্রিয়ার নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ এবং কোথাও সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণরূপে পরিণত হয়। সুতরাং রোগের পথ্যবিচারে ষড়্-রসের বিচার-বিশ্লেষণ অপরিহার্য। ইহা 'কার্বো-হাইড্রেট', 'ফ্যাট', 'সল্ট', 'প্রোটিনের' অপেক্ষা রাখে না এবং নব্য বৈজ্ঞানিক 'লেবরেটারীর টেষ্ট টিউবে' পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। (ক্রমশ)

কামলা রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদীয় গাছের গুণাগুণ

আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ

এখানে আপনাদের কাছে 'কামলা' রোগের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদীয় গাছের গুণাগুণ' সম্বন্ধে আলোচনা করব। যকৃতের অনেক রকম রোগ আছে, তাদের মধ্যে 'কামলা' রোগ একটি। সাধারণত পিত্তের দোষে যকৃতের রোগ হয়। ত্রিদোষের মধ্যে অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে পিত্ত একটি দোষ। শরীরের ধাতুসমূহ দূষিত করলে দোষ, আবার তাদের ধারণ বা পরিপুষ্ট করলে ধাতু বলে। পিত্তকে দেহের পাচক-অগ্নি বলা হয়। কারণ, পিত্তই পরিপাক করায় খাদ্যদ্রব্য। কিন্তু পিত্ত কম বা অধিক হলে রোগ সৃষ্টি করে। পিত্ত যখন অধিক হয় তখনই নানা রকমের রোগ দেখা দেয়—কামলা তাদের মধ্যে একরকম রোগ। রক্তের মধ্যে পিত্তের ভাগ বেশি হলে সর্বশরীর, বিশেষত হাত মুখ চোখ ও নখ হলদে হয়ে যায়। অবশ্য যকৃতের রক্তক পিত্তের দোষে রক্ত তৈরীতে বিকৃতি হলে এই অবস্থা হতে পারে, অথবা পিত্ত যাতে বাড়ে এমন খাদ্য খেলেও এই রোগ হতে পারে। এই কামলা রোগের চিকিৎসার জন্য কয়েকটি গাছ গাছড়ার কথা এখানে বলছি :

হরিদ্রা

প্রথমেই 'হরিদ্রার' কথা বলব—যাকে সাধারণত লোকে 'হলুদ' বলে থাকে। হলুদ বাংলাদেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়, এমন কি, ভারতের প্রায় স্থানেই মেলে। ওর নানা গুণ নানা রোগে বেশ কাজ দিয়ে থাকে।

পিত্ত যেখানে, সেখানে হলুদের রস বা হলুদ খণ্ড খণ্ড করে আখের গুড় দিয়ে খেলে পিত্ত কমে, বিশেষত, পাণ্ডু বা কামলা রোগে। বলতে গেলে যকৃতের প্রায় সব রোগে হলুদ সুফল দান করে। প্রতিদিন এর রস ½—১ তোলা মধু বা আখের গুড়সহ দুবেলা খেতে হয়।

হলুদ গায়ের রং সুন্দর করে, তাই মেয়েরা বেটে স্নানের পূর্বে গায়ে দেয়।

পেটের অসুখ বা পায়খানা পরিষ্কার না থাকার জন্য ক্রিমি হয়। সুতা ক্রিমি হোক, আর কেঁচো ক্রিমি হোক, উভয় ক্ষেত্রে হলুদের রস ½—১ তোলা প্রতিদিন গুড়সহ খেলে বেশ কাজ দেয়।

প্রস্রাবে জ্বালা ও পূঁজ থাকলে এর রস ১ তোলা সোড়াচূর্ণ ।০ আনা জলসহ খেলে ফল পাওয়া যায়। তিন দিন অল্প দিনের হলে, আর বেশি দিনের হলে ২ সপ্তাহ মধু বা গুড়সহ সেবন করতে হয়। অবশ্য এর সঙ্গে খাদ্যের বাধানিষেধ মানতে হবে।

চামড়ার রোগে যেমন—চুলকনা, পাঁচড়া, খোস, দাদ প্রভৃতি রোগে হলুদ ও নিমপাতা সমভাগে জলে সিদ্ধ করে সেই জল দিয়ে সর্বশরীর ধুয়ে ফেলতে হয়। এতে ঘায়ে যে ক্রিমি বা জীবাণু থাকে, তাও মরে।

প্রস্রাব লাল হলে হলুদের রস দু'বেলা ½ তোলা থেকে ১ তোলা মধুসহ সেবন করলে সুফল দেয়। রান্নায় যে হলুদচূর্ণ বা বাটা দেয়, তা শুধু রং করবার জন্য নয়, এতে পিত্ত কমায় ও ক্রিমি হতে দেয় না। মুখের পক্ষাঘাতে বা জড়তায় এ বিশেষ কাজ করে।

যার রক্তে দোষ আছে, অর্থাৎ পিত্তের ভাগ বেশি বা উপদংশ থেকে রক্তে দোষ জন্মে, তাতেও এ বেশ কাজ করে। সুস্থ লোকেরাও হলুদ আমাদের গরম দেশে প্রতিদিন খেতে পারে গুড়সহ শরীরের দাহ ও পিত্ত কমাবার জন্য।

কুষ্ঠে বা চামড়ার যে কোন রোগে হলুদ প্রতিদিন গায়ে বেটে দিলে ও খেলে রোগ থাকে না বা রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

গায়ে হলুদবাটা বা চূর্ণ দিলে তা পচন ক্রিয়া নষ্ট করে এবং ঘা শুকোতে সাহায্য করে।

কলেরা বা ওলাওঠার প্রথম অবস্থায় হলুদের গুড়া শীতল জলে গুলে সেবন করলে বিশেষ উপকার হয়। যদি বমিও হয় তা হলেও তিনবার অন্তত চেষ্টা করবেন খাওয়াতে, তাতেও না হলে রোগীর অবস্থা ভাল না মনে করতে হবে।

প্রমেহে পূঁজ ও জ্বালার সঙ্গে প্রস্রাব হলে ৵০ আনা সোড়া ৵ আনা গঁদ এক ছটাক জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, তার সঙ্গে ২ তোলা কাঁচা হরিদ্রার রস মিশিয়ে সেবন করলে প্রস্রাব সরল, জ্বালা ও পূঁজ-মুক্ত হয়।

হলুদের রস ২ তোলা ও গোমূত্র অর্ধ ছটাক একত্রে পান করলেও কুষ্ঠে বেশ কাজ করে থাকে। ক্রিমি রোগে হরিদ্রাখণ্ড ও বৃঃ হরিদ্রাখণ্ডও বিশেষ ফল দিয়ে থাকে। খোস, পাঁচড়া, চুলকনা, দাদ প্রভৃতি রোগে কাঁচা হলুদের রস গায়ে মাখলে ও হলুদের রস ½—১ তোলা রোজ খেলে রক্ত পরিষ্কার করে ও রোগ সারে—অবশ্য বেশি দিন এই ঔষধ সেবন করা দরকার।

কুলেখাড়া

বাংলাদেশে জলের কাছে 'কুলেখাড়া' পাওয়া যায়। এর ফুল নীলবর্ণ, কখনো সোলাপীও হয়—বীজ ক্ষুদ্র লালবর্ণ। এর পাতা বীজ ও মূল ঔষধে লাগে। পাতা ও মূল স্নিগ্ধ, প্রস্রাব বাড়ায় এবং যকৃতে রক্তবৈরীর কাজে সাহায্য করে কামলা রোগে রক্তে যাতে পিত্ত না বাড়ে সেজন্য যকৃতের কাজে আয়ুর্বেদের ঔষধের সঙ্গে এর অনুপান দেওয়া হয়। বহুদিন জ্বরে ভুগলে শরীরের রক্ত কমে, সে ক্ষেত্রে রক্তবৃদ্ধির জন্য কুলেখাড়ার রস ১—২ তোলা প্রতিদিন মধুসহ সেবন করতে হয়। শাস্ত্রীয় ঔষধের অনুপান হিসাবে এর ব্যবহার আছে। শোথ রোগে সাধারণত রক্তহীনতা থাকে। সেজন্য কুলেখাড়ার রস ১—২ তোলা রোজ সেবন করা উচিত। পাণ্ডু ও মূত্র কম হলে বা কষ্টে প্রস্রাব হলে এর পাতার রস মধুসহ ২—৩ তোলা প্রতিদিন সেবা। যকৃত ও প্লীহা রক্তবৈরীর স্থান। কুলেখাড়া পাতার রস রক্তনির্মাণে সাহায্য করে থাকে। পাথুরীতে এর মূলের রস বেশ কাজ করে, এমন কি, রক্ত দুষ্টি ও অনিদ্রায়ও এর পাতার রস সুফল দিয়ে থাকে।

চিরতা

চিরতার নাম আপনারা অনেকেই শুনেছেন, এমন কি, দেখেছেনও একে। তেতো বলে অনেকের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। দাহ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, চামড়ার রোগ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমিরোগে এ বিশেষ কাজ করে। কামলায় পিত্তাধিক্যে প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে চিরতা ভিজান জল এক ছটাক সেবন করা ভাল। প্রস্রাব লাল হলে বা কম হলে চিরতা-সিদ্ধ জল সুফল দিয়ে থাকে।

চুলকনা, পাঁচড়া, দাহ ও ক্রিমিতে চিরতা ২ তোলা জল /৷ সেরে সিদ্ধ করে প্রতিদিন সেবন করতে হয়, পাক শেষে জল থাকবে ৮ তোলা। এই

মাত্রা পূর্ণবয়স্কের জন্য। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য অর্ধ বা এক চতুর্থ মাত্রা সেবন করতে হয়। যকৃতের যে কোন রোগে এর প্রয়োগ আছে, বিশেষত কামলা রোগে পিত্ত কমাবার পক্ষে প্রায়ই কাজে লাগান হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে, অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ জ্বরেও চিরতাসিদ্ধ জল মধুসহ বেশ কাজ করে। চিরতা ১ তোলা /।০ পোয়া জলে সিদ্ধ করে এক ছটাক থাকতে নামিয়ে পান করতে হয়। চিরতাচূর্ণের মাত্রা পূর্ণবয়স্কদের পক্ষে ।০ আনা, অপ্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে এর অর্ধ মাত্রা।

কালমেঘ

এবার এমন একটি গাছড়ার কথা বলছি, যার নাম বাংলাদেশে অনেকেই জানেন, আর অনেকের বাড়ীর কাছে এই গাছ জন্মে। এর নাম কালমেঘ। এমন কি, গ্রামের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা এর ব্যবহার ও গুণাগুণ জানেন, বিশেষ করে ছেলেপুলেদের যকৃতের দোষে এর সুফল সকলেরই জানা আছে। যেখানে শিশুরা পিত্ত বা যকৃতের রোগে কষ্ট পায় বা কামলা ও পাণ্ডু রোগে ভোগে, সেখানে পিত্ত নিঃসরণের জন্য এবং পায়খানা পরিষ্কার না হলে পায়খানা পরিষ্কার করতে এর ব্যবহার আছে—ফলও বেশ হয়। এর রস তিক্ত—ক্রিমি নাশ করতেও এর ব্যবহার আছে।

ছোট বড় সকলেই এ সেবন করতে পারে। সুতাক্রিমি বা কেঁচো ক্রিমি বা পরিপাকের গোলমাল আছে যেখানে, সেখানে কালমেঘের পাতার রস ১—২ তোলা পর্যন্ত সেবন করা যেতে পারে। কামলা রোগে যকৃতে পিত্ত সঞ্চিত হয় এবং রক্তের সঙ্গে সর্বশরীরে ছড়িয়ে যায়; সর্বশরীর হরিদ্রাবর্ণ হয়। কালমেঘের পাতার রস রক্ত-নির্মাণে পিত্তের ভাগ কমিয়ে দেয়, ফলে পায়খানার সঙ্গে পিত্ত নিঃসরণ হয় এবং পিত্ত সঞ্চিত হতে পারে না। কালমেঘের পাতা ও গোল মরিচ সমভাগে বেটে ২ রতি পরিমাণ বটী প্রাতে ও বিকেলে জল ও মধুসহ সেবন করলে সহজে যকৃতের দোষ নাশ করে এবং স্বাভাবিক রক্তের সঞ্চার হয়

—আকাশবাণী কলিকাতা থেকে
প্রচারিত ও প্রকাশিত।

ফোন—৩৪-৩০-৩২

রাজবৈদ্য ডক্টর শ্রীপ্রভাকরের

সোমরস

হৃদয়শক্তি, কর্মশক্তি, স্মৃতি ও রক্তবর্ধক

শ্রেষ্ঠ টনিক—৪৲ টাকা মাত্র

রাজবৈদ্য আয়ুর্বেদ-ভবন

১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

জনস্বাস্থ্যে দ্রব্যের স্থান

কবিরাজ শ্রীমনোরঞ্জন সাংখ্যতীর্থ, অধ্যাপক, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ

পঞ্চভূতাত্মক জলতত্ত্বের গুণ সৌম্য এবং আগ্নেয়। সুতরাং জাগতিক দ্রব্যসমূহের বিপাকও দুই প্রকার। মধুর তিক্ত কষায় রস—সৌম্য এবং কটু অম্ল ও লবণ রস আগ্নেয়। মধুর অম্ললবণ রস স্নিগ্ধ আর কটুতিক্তকষায়রস রুক্ষ। সৌম্যরস শীতবীর্য এবং আগ্নেয় রস উষ্ণবীর্য বিশিষ্ট হয়। এক অপ বা জলীয় রসই অন্যান্য ভূতগুণ সংসর্গে বিভক্ত হইয়া মধুরাদি ষড় রসে বিভক্ত হইয়া থাকে, যেমন, চেতন ও অচেতন সবকিছু দ্রব্যই পাঞ্চভৌতিক এবং উক্ত ভূতগুণাধিকোই তাদের পার্থিব জলীয় প্রভৃতি ব্যপদেশ ঘটিয়া থাকে, ইহাই চরকাদি আর্ষসিদ্ধান্ত।

আবার পঞ্চ মহাভূতাত্মক উপকরণের তারতম্যবশত জাঙ্গম এবং স্থাবরাদির বর্ণ এবং আকৃতিগত ভেদও সম্ভবপর হয়। কালের অর্থাৎ বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদে ভৌতিক গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে, যেমন, হেমন্তে সোমগুণের এবং শীত গ্রীষ্মে বায়ু এবং আকাশগুণের আতিশয্য ঘটে।

দ্রব্যাশ্রিত মধুরাদি সর্বরসেই ক্ষিত্যাদি সর্বভূতগুণ বিদ্যমান—অপ এবং সোমগুণের আধিক্যে মধুর রস জন্মে, ক্ষিতি এবং অগ্নিগুণের আধিক্যে লবণরস, বায়ু এবং অগ্নিগুণের আধিক্যে কটুরস, বায়ু এবং আকাশীয়গুণের আধিক্যে তিক্তরস, বায়ু এবং ক্ষিতিগুণের আধিক্যে কষায় রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পার্থিব দ্রব্য জীবশরীরের উপচয়-সংঘাত-গুরুতা ও স্থৈর্য সাধন করে। আপ্যদ্রব্য উৎক্লেদ স্নেহবন্ধ ও অভিষ্যন্দকর—আগ্নেয় দ্রব্যে দাহ-পাক-প্রভা-প্রকাশ এবং বর্ণপ্রসাদক হইয়া থাকে—বায়ব্য দ্রব্য রৌক্ষ্য গ্লানি বিকার এবং লঘুতা কারক, আকাশীয় দ্রব্য শরীরের মৃদুতা সৌষির এবং লঘুতা সাধন করিয়া থাকে। কোনও কোনও দ্রব্য স্বকীয় প্রভাববলে বাতাদি ধাতুত্রয়ের সাম্যাবস্থা রক্ষা করে, যেমন—হরিতকী আমলকী গুডুচ্যাদি প্রভৃতি; কোনও কোনও দ্রব্য স্বকীয় প্রভাবে সমগ্র ধাতুর দুষ্টি সাধন করে, যেমন—বিষ-অহিফেনাদি; আবার কোনও কোনও দ্রব্য স্বকীয় প্রভাবে কেবলমাত্র স্বাস্থ্যেরই আনুকূল্য সাধন করে, যেমন, ঘৃতদুগ্ধাদি—এইরূপ প্রকারভেদে দ্রব্য দোষপ্রশমন ধাতুপ্রদূষণ এবং স্বস্থবৃত্তকর তিন প্রকার হইয়া থাকে এবং উহাই যোনিভেদে জাঙ্গম উদ্ভিদ এবং পার্থিবাদি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে উদ্ভিদ ৪ প্রকার, যেমন—বনস্পতি, বানস্পত্য, ওষধি ও বীরুৎ—বনস্পতি—যাহার ফুল দৃষ্ট হয় না, ফল হয়, যেমন—ডুমুর অশ্বত্থ; বানস্পত্য—যার পুষ্পান্তে ফল হয়, যেমন, আম, জাম প্রভৃতি; আর ওষধির কতিপয় ফলবন্ত, যেমন—ধান যব গম ইত্যাদি, আর কতিপয় পাকান্ত, যেমন দূর্বা প্রভৃতি।

জিহ্বা দ্বারা দ্রব্যের যাহা গৃহীত হয় উহাই রস, জল এবং ক্ষিতি উহার আধার কারণ। ভুক্ত অন্নপানাদির জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাকান্তে অন্ত্রাভ্যন্তরে

যে রসবিশেষের উৎপত্তি ঘটে, উহার নাম বিপাক। বিপাক তিনপ্রকার—অম্ল বিপাক, মধুর বিপাক এবং কটু বিপাক। অম্লরসে অম্ল, মধুর রসে মধুর এবং কটুতিক্তকষায়রসের বিপাকে প্রায়শ কটু হইয়া থাকে। অবশ্য ইহার ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়, যেমন—শুণ্ঠী কটু হইয়াও মধুর বিপাক। কুলত্থ কলায়ের কষায় রসে অম্লবিপাক—কষায়রস হরিতকী ও অম্লরস আমলকীর মধুর বিপাক—মধু ও অম্লরসের অম্লবিপাক, হরিতকীর অম্লকষায়াদি গুণে উহা পিত্ত এবং বায়ুবর্দ্ধক হইয়াও স্বকীয় প্রভাবে ত্রিদোষনাশক। অনুরূপ কারণে আমলকীও ত্রিদোষনাশক। উহার অম্লগুণে বায়ুনাশক, মধুর এবং শীতগুণে পিত্তনাশক এবং রুক্ষ তথা কষায়গুণে কফনাশক হইয়া থাকে। স্বকীয় প্রভাব অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তিবলে—এইশক্তি বলেই বাতবর্দ্ধক খদির বাতিক কুষ্ঠকেও নাশ করিতে সমর্থ।

দ্রব্যগত বীর্য দুই প্রকার—শীতবীর্য এবং উষ্ণবীর্য—বীর্য অর্থাৎ শক্তি। বীর্যহীন দ্রব্য কার্যকর হয় না। উষ্ণবীর্য কফ এবং বাতপ্রশমক পিত্তের বর্দ্ধক, আর শীতবীর্য পিত্তের প্রশমক এবং বাত ও কফবর্দ্ধক সমান গুণবিশিষ্ট বলিয়া।

যে দ্রব্যে রস বীর্য এবং বিপাক তুল্য কিন্তু কার্যে বিশেষত্ব লক্ষিত হয় উহার কারণ প্রভাব, যেমন—চিত্রক রসে কটু, বিপাকেও কটু বীর্য উষ্ণ—উহার কর্ম তদনুরূপ। কিন্তু পন্থী উষ্ণ চিত্রকেরই অনুরূপ রসবিপাক ও উষ্ণবীর্যবান হইয়াও বিরেচন ক্রিয়া করিয়া থাকে যাহা চিত্রকে সম্ভব নয়—ইহা দ্রব্য প্রভাবেই সম্ভব। ঘৃত ও দুগ্ধ সমগুণক হইয়াও ঘৃত দীপন কিন্তু দুগ্ধ নহে। দ্রব্যের নিত্যসহচর রস, সুতরাং দ্রব্যের গুণকর্মাদি রসে উপচার বা ব্যপদেশ। বস্তুত গুণকর্মাদি দ্রব্যেরই। তিন ৩টা রসে এক এক দোষকে প্রকুপিত ও প্রশমিত করে, যেমন—কটুতিক্ত এবং কষায় বাতপ্রকোপক, আর মধুরাম্ললবণ উহার প্রশমক। কটুকাম্ললবণ পিত্তবর্দ্ধক, আর মধুর তিক্তকষায় উহার প্রশমক। মধুরাম্ললবণ কফবর্দ্ধক কটুতিক্তকষায় উহার প্রশমক হইয়া থাকে। সমধাতু সমাগ্নিই সুস্থ রাখে। সুতরাং যাহারা ইহা বিবেচনাপূর্বক আহার বিহারাদি করে তাহারাই সমধাতুক হয়। চরকোক্ত আহারবিধি বিশেষায়তনাদি অষ্টক অবশ্যকর্তব্য। উহা প্রকৃতি-করণ-সংযোগ-রাশি-দেশ-কাল-উপযোগ সংস্থা এবং উপযোক্তা, এই আট প্রকার। এই সকলের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় বলিয়া বিরত রহিলাম। দেশভেদে দ্রব্যগুণের তারতম্য ঘটে, যেমন—শ্মশানজ ভেষজ ও হিমালয়জ ভেষজে। সেই দেশের মাটিতে বা জলবায়ুতে যার জন্ম সেই দেশের জাঙ্গম উদ্ভিদ বা পার্থিবাদি ভেষজ দ্রব্যই তার স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত অনুকূল জীবন-রসায়নস্বরূপ। পরন্তু, বিজাতীয় বৈজ্ঞানিক ঔষধের প্রস্তুত প্রণালীও বহুলাংশে আয়ুর্বেদমতে দোষদুষ্ট। এই কারণে কোনও কিছুর একট্রাক্ট বা বাহিরের এল্‌কোহল বা অনুরূপ অন্য কিছু দ্বারা কল্প বা পাচনাদির পচননিরোধ কল্পাদির উপরও বৈগুণ্য-শঙ্কায় অনাস্থা আসা স্বাভাবিক।

---

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৬তম বর্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ১৩৭৪ কায়চিকিৎসা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণের পুরাবৃত্তি।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

সংক্ষিপ্ত বসন্ত চিকিৎসা ও বিবিধ মুষ্টিযোগ

পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাশশর্মা, বৈদ্যশাস্ত্রী

(১৩৭৩ কার্ত্তিক সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

বসন্ত চিকিৎসা

ময়মনসিংহনিবাসী প্রখ্যাত বসন্তচিকিৎসক নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, উকিল মহোদয়ের সহকর্মী নিষ্ঠাবান অনাসক্ত কর্মী শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ স্বামী মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং তাঁহারও সহকর্মীরূপে থাকিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত —ব্যাপক প্রচারের অনুমোদন সাপেক্ষে জনসেবার জন্য প্রদত্ত হইল।

ঔষধ ব্যবহার প্রণালী—

বসন্তের গুটি উঠাইবার জন্য (প্রথমাবস্থায়)—

(১) প্রথমতঃ পালোর ছোপ দিবে, তাহাতে যদি গুটি না বাহির হয়, তবে নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জলের ছিট্ দিবে (কিন্তু রক্ত প্রকোপ থাকিলে দিবে না)।

ইহাতেও যদি ভাল করিয়া গুটি না উঠে এবং পেটের অবস্থা ভাল থাকে, তবে হাঁসের ডিমের ভিতরের সাদা অংশ পরিত্যাগ করিয়া লাল কুসুম ১টা চিনির সহিত মিশাইয়া অবস্থানুসারে ব্যবহার করিবে।

(২) যমানী তুলসী রসের সহিত বাটিয়া গায়ে মর্দ্দন করিলে চাম ও বসন্ত উভয় রোগের গুটিই বাহির হয়।

(৩) বসন্তের গুটিসমূহ সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইলে কাঁচা হরিদ্রার রস, ভেলাকুচা পাতার রস ও শতমূলীর রস মাখনসহ ফেটাইয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

বসন্ত রোগীর মাথা অত্যন্ত গরম বোধ হইলে শূকরের তৈল ব্যবহার করিবে।

বসন্তে প্রলেপ :—

নিমপাতা ২ তোলা, ৵৹ পোয়া ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিয়া ছাকিয়া উহাতে ১ তোলা কাঁচা হরিদ্রার রস উত্তমরূপে ফেটাইয়া কোমল সূক্ষ্ম ক্রুশ বা পাখীর পালক দ্বারা আস্তে আস্তে রোগস্থানে ব্যবহার করিবে।

কাস ও বুক বেদনা হইলে :—

পিপ্পলী ৷৹ তো, কাবাবচিনি ৷৹ তো, গোল-মরিচ ৷৹ তো, আকরকরা বচ ৷৹ তো জলদ্বারা বাটিয়া ৩ রত্তি বটী করিবে। অনুপান—বাসক পাতার পুটপক্ক রস মধু বা কাঁচা কণ্টকারীর রস বা শুষ্ক কণ্টকারীর কাথ মধুসহ সেব্য।

কুল্লীর জন্য—

চামেলী পাতা (জাতী বা মালতীপাতা), মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারিতক্ক, আমলকী, যষ্টিমধু সমান ভাগে গ্রহণ করিয়া ১৬ গুণ জলে সুসিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া এই কাথের জলে কুল্লী করাইবে।

অত্যধিক জ্বালায় :—

নিম পাতার রস, গাঁদালের রস, কাঁচা হরিদ্রার রস সমভাগে মিশাইয়া আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিয়া লাগাইবে।

শুধু হাত পায়ের জ্বালায় কুলপাতার রসেও উপকার দর্শে। সর্ব শরীরের অত্যধিক জ্বালায়—কোমল জলপদ্মের পাতা সংগ্রহ করিয়া তদুপরি শোয়াইবে।

ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গে রক্তস্রাব হইলে :—

আমলকী চূর্ণ ঘৃতের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া পেটে 'প্লিসটার্ড' দিবে।

গলা হইতে রক্তস্রাব হইলে—

বাসক ছাল চূর্ণ ১ তোলা, কিস্‌মিস্ ১ তোলা, হরিতকী চূর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে বাটিয়া ৵০ আনা মাত্রায় এই অবলেহ ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

অধোমার্গ হইতে রক্ত পড়িলে :—

দুরালভা চূর্ণ ॥০ তোলা, ক্ষেৎপাপড়া চূর্ণ ॥০ তো, প্রিয়ঙ্গু চূর্ণ ॥০ তোলা, চিরতা ॥০ তোলা, বাসক-ছাল ॥০ তোলা একত্র পিষিয়া ৵০ আনা মাত্রায় এই চূর্ণ মিশাইয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

প্রস্রাব কম হইলে বা উদ্বেগ বোধ হইলে :—

(১) ২ তোলা গোক্ষুর কুট্টিত করিয়া /॥০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া শীতল হইলে ২ বারে ঐ কাথ দিবসে পান করাইবে।

(২) অর্দ্ধ কাচ্চা ডিমের জলের সহিত ২ রতি সোড়া মিশ্রিত করিয়া প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

বসন্ত শুকাইবার সময় টান ধরিলে—

(১) মাখন অথবা ঘৃত /॥০ পোয়া, নিমপাতার রস ১ তোলা, হরিদ্রা রস ১ তোলা উত্তমরূপে ফেটাইয়া মলম তৈয়ার করিবে। উহা সমগ্র শরীরে পাখীর পালক দ্বারা লাগাইবে।

(২) ঘৃত ২ তোলা, কাঁচা হরিদ্রার রস ॥০ তোলা, কর্পূর চূর্ণ ৪ রতি উত্তমরূপে মর্দন করিয়া টানের স্থানে আস্তে আস্তে মালিশ করিবে।

তৈল প্রয়োগ :—

দেশী কালজীরা ১১ তোলা, রসোন ১ তোলা, তুঁতে ভস্ম ৵০ আনা, শোধিত গন্ধক ভস্ম ১ তোলা ও তিল তৈল /৵০ পোয়া। কালীজীরা ও রসোন উত্তমরূপে থেতো করিয়া তৈলের সঙ্গে মিশাইবে এবং উহার সঙ্গে তুঁতে ভস্ম ও গন্ধক চূর্ণ উত্তমরূপে মর্দন করিয়া রৌদ্রে পক্ক করিবে।

(খ) শ্বেত করবীর মূল ১ তোলা, নিমপাতার রস ১ তোলা, জারিত ভেলা ॥০ তোলা, তুঁতে ভস্ম ৵০ আনা, তৈল /৵০ পোয়া।

প্রকৃত শ্বেতকরবী (বিলাতী নকল শ্বেতকরবী নহে, আমাদের পল্লীতে ও বাড়ীতে গাছ আছে) ও ভেলা উত্তমরূপে পিষিয়া উহার সঙ্গে নিমপাতার রস ও তুঁতে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া রৌদ্রে পক্ক করিয়া ব্যবহার করিবে।

(ক্রমশ)

রসবিজ্ঞান*

কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন, কবিরত্ন, সাংখ্যকৃষণ

অধ্যাপক ও চিকিৎসক, আয়ুর্বেদ বৈজয়ন্তীপীঠ কলেজ ও হাসপাতাল

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ষট্‌ত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনে রস-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা।

পঞ্চভূতাৎ জগৎসৃষ্টি পঞ্চভূতাচ্চলীয়তে।

পঞ্চ মহাভূত হইতে জাগতিক সমস্ত বস্তুরই উদ্ভব এবং পঞ্চমহাভূতেই সমস্ত বিলীন হয়। রস, বীর্য, বিপাক প্রভাব অপেক্ষা দ্রব্যই প্রধান, যেহেতু দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই রসাদি পদার্থ অবস্থিতি করে। দ্রব্য পঞ্চভূতাত্মক—তাহা পৃথিবীকে আধারীভূত করিয়া উৎপন্ন হয়। জল তাহার উৎপত্তির প্রধান কারণ এবং অগ্নি পবন আকাশ ইহারা দ্রব্যের সমবায়ী কারণ; অর্থাৎ ইহাদের সংযোগবিশেষে দ্রব্যের উৎপত্তি। সুতরাং সকল দ্রব্যই পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন ও আকাশ এই পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই পঞ্চভূত পদার্থের আধিক্যানুসারে দ্রব্য বিশেষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পৃথিবীর আধিক্যে—পার্থিব, জলের আধিক্যে জলীয়—এইরূপ বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

পঞ্চভূত পদার্থের সংযোগে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহা এক রস বিশিষ্ট হয় না; অর্থাৎ অনেক-রসবিশিষ্ট হয়—আধিক্যানুসারে রসের বিশেষ হয়—অর্থাৎ মধুর রসের আধিক্যে মধুর, অম্লরসের আধিক্যে অম্ল, লবণ রসের আধিক্যে লবণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা হয়।

যে দ্রব্যের যে রস স্পষ্টরূপে রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, সেই দ্রব্য সেই রস বলিয়া অভিহিত হয় এবং তাহাতে যে রস অব্যক্ত থাকে তাহাকে অনুরস বলা যায়—যে রস ব্যক্ত রস কিন্তু আস্বাদনের কিঞ্চিৎপরে অনুভূত হয় তাহাকেও অনুরস বলে—

উষ্মাম্বৈকরসং দ্রব্যং ভূতসংঘাত সম্ভবাৎ

নৈকদোষোদ্ভবো রোগাস্তত্র ব্যক্তো রস স্মৃতঃ।

অব্যক্তোঽনুরসঃ কিঞ্চিদন্তে ব্যক্তোঽপি বেদ্যতে॥

দ্রব্য এক রসবিশিষ্ট নয় বলিয়া রোগ সকলও এক দোষবিশিষ্ট হয় না, যেহেতু মধুরাদি রস-ভেদে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে সুতরাং সকল রোগেরই ত্রিদোষের প্রকোপ অনুভূত হয়; তবে যে রোগে যে দোষের আধিক্য থাকে, সে-রোগ সেই দোষজ বলিয়া কথিত হয়।

দ্রব্যে রসোগুণোবীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেবচ

পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ।

দ্রব্যে—রস, গুণ, বীর্য, বিপাক ও শক্তি (প্রভাব) এই পাঁচটি অবস্থিত হইয়া নিজ নিজ কার্য সম্পন্ন করে।

মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু, কষায় এই ষড় বিধ রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে—ইহাদের পূর্ব পূর্বটি যথাক্রমে বলকারক। অর্থাৎ কষায় অপেক্ষা কটু, কটু অপেক্ষা তিক্ত, তিক্ত অপেক্ষা লবণ, লবণ অপেক্ষা অম্ল আর অম্ল অপেক্ষা মধুর রস অধিক বলকারক।

চরক—বিমান স্থানে এই ষড় রস সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে শরীরের পুষ্টি সাধন করে কিন্তু সকল রস সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত না হইলে বাত, পিত্ত এবং

কফ প্রভৃতি দোষের প্রকোপ হয় এইরূপ বর্ণিত আছে।

দোষ—তিন প্রকার বাত পিত্ত কফ। ইহারা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে শরীরের উপকার সাধন করে কিন্তু বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে নানা প্রকার রোগ জন্মাইয়া শরীরের ক্লেশদায়ক হয়।

স্বাদু অম্ল লবণ রস—বাতনাশক কিন্তু কফকারক—তিক্ত কটু ও কষায় রস কফঘ্ন কিন্তু বায়ুজনক—কষায় তিক্ত মধুর রস পিত্ত নাশক এবং অম্ল লবণ কটুরস পিত্তজনক। যে সকল রস বায়ুনাশ করে সেই সকল রসে যদি রৌক্ষ্য লাঘব ও শৈত্য গুণ থাকে তাহা হইলে তাহারা বায়ুনাশে সমর্থ হয় না। যে সকল রস পিত্তপ্রশমক সেই সকল রসে যদি তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও লঘুত্ব থাকে তাহা হইলে তাহারা পিত্ত বিনাশ করিতে পারে না; আর যে সকল রস শ্লেষ্মাপ্রশমক সেই সকল রসে যদি স্নেহ গৌরব ও শৈত্য গুণ থাকে তাহা হইলে তাহারা কফ বিনাশ করে না।

চরক বিমান স্থান—তিনটি রস একটী দোষের জনক, আবার তিনটি রস একটী রসের শান্তিকারক, যথা—কটু তিক্ত কষায় রস বায়ুকে জন্মায়, আবার মধুর অম্ল ও লবণ রস বায়ুর শান্তিকারক। কটু অম্ল লবণ রস পিত্তজনক—মধুর তিক্ত কষায় রস পিত্তের শান্তিকারক। সেইরূপ মধুর অম্ল লবণ রস দ্বারা শ্লেষ্মার উৎপত্তি হয় এবং কটু তিক্ত কষায় রস দ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি হইয়া থাকে।

রস এবং দোষের একত্রীভাব হইলে যে সকল রস যে সকল দোষের সহিত সমান গুণ, অথবা সমান গুণযুক্তিষ্ঠ হয়, সেই সকল রস অত্যন্ত হইলে সেই সকল দোষের বৃদ্ধি করে। সেইরূপ বিপরীত গুণ, অথবা বিপরীত গুণযুক্তিষ্ঠ রস অত্যন্ত হইলে তেতর দোষের শান্তি করে। এই ব্যবস্থার নিমিত্ত পরস্পর অসংসৃষ্ট ছয় প্রকার রস এবং পরস্পর অসংসৃষ্ট তিনপ্রকার দোষ উপদিষ্ট হইল। কারণ, এই সকল রস ও দোষের সংসর্গ ও বিকল্পভেদে অসংখ্য বিস্তার হয়, যেহেতু বিকল্পদের সংখ্যা করা যায় না।

মধুর রসের গুণ—

শীতবীর্য বাতু-শুক্র—বল প্রদ-নেত্রহিত-বাত-পিত্তঘ্ন-সৌম্য-মল ও ক্রিমিজনক। ইহা বালক-বৃদ্ধ-ক্ষত-ক্ষীণ ব্যক্তির বং বর্ণ কেশ ইন্দ্রিয় ও ওজঃ-পদার্থের পক্ষে প্রশস্ত।

মধুর রস—স্বাদেণ কণ্ঠ্য গুরু শুক্রসংযোজক বিষয় পিচ্ছিল স্নিগ্ধ প্রীতিপদ ও আয়ুষ্কর।

অতি সেবনে—অর শ্বাস গলগণ্ড অর্বুদ ক্রিমি স্থৌল্য অগ্নিমান্দ্য মেহ মেদ এবং কফজ রোগসমূহ উৎপাদন করে।

অম্ল রসের গুণ—পাচক, রুচিজনক, পিত্ত-শ্লেষ্মা ও শোণিতপ্রদ, লঘু, গ্রেথন, উষ্ণ, স্পর্শশীতল, ক্লেদোৎপাদক, বাতঘ্ন, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, সারক, শুক্র-মলাদির বিবদ্ধতা আনাহ ও দৃষ্টিনাশক, রোমাঞ্চকর, দন্তহর্ষণ এবং অক্ষি ও ভ্রূর সঙ্কোচক।

অতি সেবনে—ভ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, ভিমির রোগ, রক্ত সদি পাণ্ডুরোগ, বীসর্প, শোথ, বিস্ফোটক ও কুষ্ঠরোগ আমাশয় হয়।

লবণ রসের গুণ—শোধন (বমন ও বিরেচন) রুচিকর, পাচক, কফ-পিত্তকারক, পুরুষত্বনাশক, বাতহর দেহের শৈথিল্য ও মৃদুতাকারক, বলনাশক মুখে জলোৎপাদক, গণ্ড ও গলদেশের দাহকারক।

অতি সেবনে—অক্ষিপাক, রক্তপিত্ত, কোঠ, ক্ষতাদি উপদ্রব বলী কেশের শুক্লতা কেশনাশক, (টীকা) কুষ্ঠ বিসর্প তৃষ্ণাকারক।

কটু রসের গুণ—উষ্ণবীর্য, তীক্ষ্ণ, বিশদ বাত-পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মঘ্ন, লঘু, আগ্নেয়, ক্রিমি-কফ ও বিষ-নাশক, রুক্ষ, স্তন্যহর, মেদ ও শ্লৈষ্মাপকর্ষক, নাক-মুখাদির লালাস্রব মন্দাগ্নিদীপক, আমপাচক, রোচক, মেদ-বসা-মজ্জা-মলমূত্রশোষক, স্রোতঃ-প্রকাশক, মেদ-মলবিবদ্ধতাকারক।

অতি সেবনে—ভ্রান্তি-দাহ-মুখ-তালু-কণ্ঠশোষ-কণ্ঠাদির পীড়াকারক ও দেহের বল কান্তি বিনষ্ট-কারক।

তিক্ত রসের গুণ—শীতবীর্য, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা জ্বর তিক্ত কফ ক্রিমি কুষ্ঠ বিষ উৎক্লেশ দাহ রক্তদুষ্টি নাশক, রোচক কিন্তু নিজে আরোচিষ্ণু ও স্তন্য-বিশোষক বাতজনক অগ্নিকর রুক্ষ ও লঘু।

অতি সেবনে - শিরঃশূল মন্যাস্তম্ভ, প্রীতি কম্প-মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে, বল ও শুক্রের ক্ষয় করে।

কষায় রস—ক্ষতপূরক, মলসংগ্রাহক, গাত্রস্তম্ভক, ক্ষতশোধক লেখন, পীড়ক, সৌম্য ক্ষত মজ্জাদি শোধক বাত প্রকোপক, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক রুক্ষ শীতল লঘু-স্তম্ভক প্রকাশক আমরসের স্তম্ভক ও বিষম গুণান্বিত।

অতি মাত্রায় সেবনে—জিহ্বার জড়তা কণ্ঠ-স্রোতের বিবদ্ধতা হনুগ্রহাদি বায়ুরোগ উদরাধ্মান হৃৎপীড়া আক্ষেপাদি উপস্থিত হয়।

ষড় রসের গুণ—অতি সেবন-গুণ কার্য্যাদি বর্ণনা করা হইল - বীর্য বিপাক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একটি পুস্তকে পরিণত হইবে। তবে দ্রব্যের সমগুণ থাকিলে কতকগুলি দ্রব্যের প্রভাবে অন্য গুণ সম্পন্ন হয়, যথা মধু, শুঠ, আমলকী, খদিরকাষ্ঠ, দন্তী, চিত্রক প্রভৃতি দ্রব্য।

† আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশন (১৩৭৪) উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য-দ্রব্যবিজ্ঞান বিভাগে লেখক কর্তৃক 'রসবিজ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবন্ধের অনুদিদি পূর্বেই প্রকাশিত হইল —প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

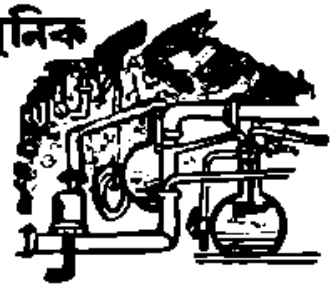

বাত রক্ত ও দুর্বল রোগ আরোগ্য

ইহা ছাড়া গাত্রে চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙ্গুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিত ক্ষত ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় পুস্তক পাঠকরুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা

১ নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬১-২৩৫৯)

শাখা :—৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

আয়ুর্বেদে কায়চিকিৎসা*

বৈদ্যাচার্য কবিরাজ শ্রীঅমলাচরণ সেন
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ হাসপাতাল

কায়চিকিৎসা বলিলে প্রথমত সোজাসুজিভাবে আমাদের ইহাই প্রতীতি হয় যে, কায় অর্থাৎ সর্ব শরীরের চিকিৎসা। জঠরাগ্নির বিকৃত অবস্থাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য যাঁহারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহারাই কায়চিকিৎসক বলিয়া অভিহিত হন।

ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্বেদে কায়-শল্য-শালাক্যাদি অষ্টাঙ্গের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই ভারতীয়দের জাতীয় চিকিৎসাই ছিল একমাত্র অবলম্বন—আশা ভরসার স্থল। সে-যুগে আজকালকার দিনের মত কোন বিকল্প চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রচলন ছিল না, আর প্রয়োজনও ছিল না, কারণ, তখন উহা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ—আয়ুর্বেদ কোন এক মহান গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের যুগ। ভারতীয় বৈদিক আর্য ঋষিগণই ছিলেন উহার প্রবর্তক বা প্রবক্তা।

কালক্রমে উক্ত আয়ুর্বেদ ভাষান্তরিত ও রূপান্তরিত হইয়া প্রথমে আরব, পরে মিশর, গ্রীক, রোম, এমন কি, সুদূর ইউরোপে পর্যন্ত সম্প্রসারিত ও প্রচলিত হয়। এই পাশ্চাত্য দেশ বর্তমানে সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছে—যুদ্ধ করিতেছে তার নব্য বিজ্ঞানসম্মত সূচীবেধাদি অদ্ভুত ফলপ্রদ চিকিৎসা-বলীর প্রয়োজনায়। উহার যে নব নব রূপায়ণ, অভিনব আবিষ্কারমূলক চিকিৎসা-পদ্ধতি উহারও উৎপত্তি ও উৎসের মূল ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান। ইহাতে সূচীবেধেরও উল্লেখ রহিয়াছে প্রস্থান-পূর্ব সূচিকাভরণাদি সংপ্রয়োগের মাধ্যমে ভারতীয় চিকিৎসায় রক্ত দ্বারা রক্তাধানের বিধানও অজ্ঞাত ছিল না। ভারতীয় চিকিৎসাই আদিম চিকিৎসা—উহাই অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আলোক সম্পাত করিয়াছে। ইহা রূপক নহে—ঐতিহাসিক সত্য। উক্ত চিকিৎসার মূলতত্ত্ব বা সূত্র অবলম্বনেই যে অন্যান্য সর্বপ্রকার চিকিৎসার উদ্ভব এবং আয়ুর্বেদ-চিকিৎসাই এই অগণিত জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু ক্ষয়িষ্ণু রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল ইহা আজ অনেকেই জানেন ও মানেন। আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসার বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হইয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই সেই উদাত্ত কণ্ঠের অমূল্য আহ্বান:—

"যস্য দেশস্য যোজন্তু জন্তবঃ তস্যৌষধং হিতম্"।

—চরক সংহিতা

অর্থাৎ যে দেশের মাটিতে বা জলবায়ুতে যার জন্ম সেই দেশের জাঙ্গম, উদ্ভিদ বা পার্থিবাদি ভেষজ দ্রব্যই তার স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত অনুকূল জীবন-রসায়নস্বরূপ। বর্তমানে কেহ কেহ সৌকর্যার্থ অনুপান বা সহপান নিরপেক্ষ ঔষধের কল্পনা করিয়া থাকেন কিন্তু উহা সমীচীন হইবে না। আর সমস্তক প্রাণবন্ত সহপান বা অনুপানই ঔষধগত সুপ্ত ভেষজ শক্তিকে জাগ্রত করিতে সমর্থ। সুতরাং অনুপানের সহায়তা অনস্বীকার্য

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সাধ্য রোগের বিনাশ সাধন করে কিন্তু অন্য চিকিৎসার মত অপর কোন

উপদর্গ রোগ উৎপন্ন করে না এখানেই জাতীয় চিকিৎসা-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাভিব্যক্তি সূচিত হয় এবং এই কারণেই উক্ত চিকিৎসা পৃথিবীতে চির-অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বর্তমানে অনেকে আধুনিক কালের কোন কোনও রোগের নাম বা লক্ষণাদির সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়, এমন কি, আয়ুর্বেদসেবীরা পর্যন্ত নিজেদের অত্যন্ত রিক্ত ও অসহায় বোধ করিয়া দুঃখিত ও লজ্জিত হন। সে-ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, রোগ যে কালে যে মূর্তিতে বা যে প্রকারেই আবির্ভূত হউক না কেন, আয়ুর্বেদে তাহার চিকিৎসা-বিধান অতিসুন্দর ও শৃঙ্খলার সহিত সুবিন্যস্ত রহিয়াছে। অপর চিকিৎসা-শাস্ত্রে রোগকে যে-আখ্যায় আখ্যায়িত করুক না কেন, আয়ুর্বেদে উক্ত রোগের এক কথায় মুখরোচক বা শ্রুতিমধুর কোন নাম না থাকিলেও প্রকৃত বৈদ্যসম্প্রদায়ের সেজন্য অসহায় বা লজ্জিত বা দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না; কারণ ত্রিকালদর্শী আচার্য চরক ইহা ভাবিয়াই সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন "বিকারাণামকুশলো নির্দিশীয়াৎ কদাচন। নহি সর্ববিকারাণাং নামতোঽস্তি ধ্রুবা স্থিতিঃ।" অর্থাৎ বিচারপূর্বক নামকরণে অকুশল চিকিৎসক কোথাও নামের অনুল্লেখ থাকিলেও লজ্জিত বা দুঃখিত হইবেন না, যেহেতু সর্বক্ষেত্রে সর্ব রোগের নামকরণ সম্ভবপর নহে। আয়ুর্বেদ-সেবীদের সে-কারণ আধুনিক কালের ব্লাক ফিভার, ক্যানসার, করোনারী থ্রম্বোসিস্ প্রভৃতি রোগের নাম না থাকায় কিছু আসে যায় না। অনুসন্ধিৎসার সহিত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক বিচার-বুদ্ধির দ্বারা রোগনির্বাচনপূর্বক যথোক্তনিয়মে চিকিৎসা করিলে রোগ নিরাময় হইয়া থাকে, নাম তাহার যাহাই হউক না কেন। নামের চিকিৎসা নহে—চিকিৎসা লক্ষণাক্রান্ত রোগের। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্লাক ফিভারের উল্লেখ করা যাক—যে-রোগের নামে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয় সকলের। অনুচিত আহার-বিহারাদির কারণে, অথবা আগন্তুক বিষের বিষাক্ততায় বায়ু প্রকুপিত হয় এবং উক্ত প্রকুপিত বায়ু রসরক্তাদি সপ্তধাতুকে শোষণ করিয়া ব্লাকফিভার রোগ উৎপন্ন করে। রস-রক্ত উক্ত জ্বরের আশ্রয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় মত বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় উক্ত জ্বর আয়ুর্বেদোক্ত বিষম জ্বরের প্রকারভেদমাত্র—বায়ুর গতিবৈষম্যহেতু আগন্তুক বিষানুবদ্ধ ধাতুশোষ বিষমজ্বরই উক্ত অভিনব নামের ব্লাকফিভার। এই বিষমজ্বরমাত্রই ত্রিদোষাক্রান্ত এবং বায়ুর গতিবৈষম্যই ইহার মুখ্য কারণ।

বায়ু-পিত্ত-কফরূপী ত্রিশক্তির সাম্যাবস্থার নাম স্বাস্থ্য এবং হানি ও বিকৃতির নাম রোগ। এই শক্তিত্রয়ের নাম দোষ ও বটে, ধাতু ও বটে। আয়ুর্বেদের আটটি শাখাতেই এই মূল সিদ্ধান্ত প্রসারিত। এই হেতু বিভাগ আটটি হইলেও প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক রহিয়াছে। কায়-চিকিৎসাবিদগণ ত্রিদোষতত্ত্বের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল হইলেও কাহারও এখানে নিরপেক্ষ হইবার উপায় নাই

এই দোষত্রয় হইতে ব্যাধি দুই প্রকার দেখা যায়—নানাত্মজ ও সামান্যজ। অতিসার প্রভৃতি একজ, দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতভাবে যে প্রভাব-বিস্তার করিয়া নানাত্মজ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাই সামান্যজ ব্যাধি অর্থাৎ আশুজ—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার নিজস্ব যে প্রভাব তাহাই নানাত্মজ। আয়ু-র্বেদকর্ণিনিশ্চয় গ্রন্থে সামান্যজ ব্যাধি নির্দেশ করিয়া

রোগসমূহ মধ্যে একমাত্র ৭ রোগকেই নির্দিষ্ট নানোক্ত মধ্যে একমাত্র বাতব্যাধিকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কতকগুলি নূতন রোগের নাম ঘোষণা করিয়া এদেশে আয়ুর্বেদের কবিনিশ্চয় গ্রন্থের নির্দিষ্ট রোগসমূহের অতিরিক্ত রোগ এদেশে আমদানি করিয়াছেন কিন্তু এ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদের তত্ত্বদর্শী আচার্যগণ বহু পূর্বেই বর্তমানে যে রোগ দেখা যাইতেছে ও ভবিষ্যতে যে রোগ জন্মিবে তাহা ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে যুক্তি দেখাইয়াছেন। আমরা কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব পাশ্চাত্য আমদানি রোগগুলি নূতন নহে, সকলই ত্রিদোষের অন্তর্ভুক্ত। কায়চিকিৎসা সম্বন্ধে বহু কিছু বলিবার থাকিলেও আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি আশঙ্কায় আর কিছু বলা সম্ভব হইল না। উপসংহারে বলিতেছি, ভারতের বুকের উপর দিয়া বহু রাষ্ট্র বিপ্লবের ধ্বংসলীলা আমাদের বহু রত্নরাজি বিধ্বস্ত করিয়াছে—ভারতের সম্পদ, কত চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গ্রন্থ, কত জ্যোতিষ গ্রন্থ—কত কাব্যগ্রন্থ যে নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা বহু জিনিস হারাইয়াছি—চরক গ্রন্থে আমাদের এইরূপ অনেক নজির আছে। আয়ুর্বেদের প্রগতিশীলতা বলিতে আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের নিকট হইতে আয়ুর্বেদসেবীদের অস্ত্রোপচারের নিপুণতা শিক্ষার প্রয়োজন কি ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন পরিপূরক হিসাবে। ইহা করাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সমগ্র চিকিৎসা-পদ্ধতিকে আয়ুর্বেদবিজ্ঞানসম্মত করার অপরিহার্যতা আছে। এই অপরিহার্যতা রক্ষা এবং সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে হইলে সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজনিয়তা খুব বেশী।

সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সকলকে পরিচালনা করিতে হইবে প্রত্যেক প্রদেশে সঙ্ঘশক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে। আন্তঃপ্রাদেশিক সংযোগ স্থাপন করিতে হইবেই—পল্লী অঞ্চলে এ্যালোপ্যাথিক হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের মত আয়ুর্বেদ-হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং গবেষণা-বিভাগ খুলিবার জন্য সরকারকে চাপ দিতে হইবে। উহাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য আয়ুর্বেদের তত্ত্বকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে এবং এ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মধ্যে উপযোগিতা কাহার বেশী তখনই তাহা প্রমাণিত হইবে।

আয়ুর্বেদের সর্বপ্রকার প্রগতি আয়ুর্বেদের নীতিগত করিতে হইবে, তবেই উহার উৎকর্ষ হইবে।

বর্তমান সরকার বলিতে গেলে আয়ুর্বেদের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই—নামে একটী মাত্র কলেজকে আয়ুর্বেদ ষ্টেট কলেজহিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার পঠনপাঠন-ক্রিয়া—শিলাবাস্-সংক্রান্ত কোন বিধানই ঠিক হয় নাই। একটী মাত্র 'সিঙ্গল ব্লাগস-রিসার্চ' বিষয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট সামান্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন। ঠিকভাবে গবেষণা চালাইবার জন্য প্রচুর অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যাহাতে দেন তাহার জন্যও চাপ দিতে হইবে। অবশেষে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতিকে তাহার অদম্য উৎসাহের জন্য ও আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

---

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ১৯তম বার্ষিক অধিবেশন (১৩৭৩) উপলক্ষে কায়চিকিৎসা বিভাগের সভাপতির অভিভাষণের অনুলিপি পূর্বেই প্রকাশিত হইল। কলিকাতা-ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে, সোমবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৭৩, এই অধিবেশন হইবে।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।

জীবনী

কবিরাজকুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন

কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন, সাহিত্য-ভারতী

ভারতের স্বনামধন্য ধন্বন্তরিকল্প আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক—জন্ম ২রা ভাদ্র, সোমবার, ১২৩১ বঙ্গাব্দ। জন্মস্থান ঢাকা বিক্রমপুর পদ্মাতীরবর্ত্তী কোমরপুর গ্রাম। ধন্বন্তরি গোত্রীয় বৈদ্য বিপ্রকুলে আবির্ভূত। তদীয় পিতৃদেব ঢাকা তথা সমগ্র পূর্ববঙ্গের প্রথিতযশা আয়ুর্বেদাচার্য কবিরাজ নীলাম্বর সেন মহাশয় একজন জন্মজন্মা আয়ুর্বেদসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি আয়ুর্বেদ, তন্ত্র ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার সাফল্যের নিদর্শন-স্বরূপ একটি দেশ-প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল—

"নীলাম্বরের বড়ী।
গণি মিঞার ঘড়ি।"

দ্রঃ—সাহিত্যাচার্য ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিত আত্ম চরিত "বঙ্গ ভাষার লেখক" গ্রন্থে

ব্যাখ্যা বা মন্তব্য—

"প্রবন্ধটির অর্থ গণি মিঞার ঘড়ি যেমন ঠিক সময় দেয়, কবিরাজশ্রেষ্ঠ নীলাম্বরের বড়ীও তেমনি অব্যর্থ।"

গঙ্গাপ্রসাদ সেনপ্রসঙ্গে 'জীবনী কোষ, ২য় খণ্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা (ভারতীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিত শশীভূষণ বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত)—পরিণত বয়সে, প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে বঙ্গাব্দ ১২৪৭ সনে এক শুভ গ্রাহস্পর্শ যোগে "স্বর্গীয় নীলাম্বর গঙ্গাতীরে বাস উদ্দেশ্যে সপরিবারে আসিয়া কলিকাতায় কুমারটুলীতে বাস করিতে থাকেন এবং কিছুকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই নীলাম্বর সেন মহাশয়ই কুমারটুলীর কবিরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ও উত্তর-কালে স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের অলোকসামান্য প্রতিষ্ঠাই ইহাদিগকে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে বাধ্য করে।"

মালঞ্চ, মাসিক পত্র, বৈশাখ, ১৩২৪
৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা—
"স্বর্গীয় কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন"-
শীর্ষক জীবনী-প্রবন্ধ
লেখক—তদীয় ছাত্র কবিরাজ
পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ সেনশাস্ত্রী—

"বঙ্গাব্দ ১২৪৯ সনের বৈশাখী একাদশী তিথিতে কুমারটুলীর কবিরাজপরিবারের প্রথম প্রতিষ্ঠা এইরূপে তিনি সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন। পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী নদীর তীরে বাসের উদ্দেশ্যে বজরা নৌকাযোগে সপরিবারে কলিকাতা কুমার-টুলীর গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন এবং তদবধি এই স্থানেই বাসস্থান নির্মাণপূর্বক বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ গঙ্গাপ্রসাদ, মধ্যম দুর্গাপ্রসাদ এবং কনিষ্ঠ অন্নদাপ্রসাদ। তিন জনই বাংলার বিখ্যাত কবিরাজ, তন্মধ্যে গঙ্গাপ্রসাদ ভারতপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, সংস্কারক ও প্রচারকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নীলাম্বরের মৃত্যুর সময় গঙ্গা-প্রসাদের বয়ঃক্রম মাত্র ১৮ বৎসর। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালে গঙ্গাপ্রসাদ কাছে ছিলেন। পিতৃদেবের চরণ ধারণ-পূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বাবা,

এখন আমাদের কি হইবে?" তিনি তদুত্তরে সহাস্যবদনে শুভাশীষপূর্ণ আশ্বাস বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একদিন আসিবেই, তাহাতে অভিভূত হইতে নাই; কোন চিন্তা করিও না। তুমি চিকিৎসাজগতে একদিন সম্রাটের স্থান লাভ করিবে।" মৃত্যুর পথযাত্রী পুণ্যপ্রাণ মহাসাধক যে ভবিষ্যৎ বাণী ব্যক্ত করিয়াছিলেন অক্ষরে অক্ষরে তাহা ফলিয়াছিল। হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক ও কলিকাতা ধন্বন্তরি বিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর কবিরাজ গোপাল চন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ও গঙ্গাপ্রসাদের খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন সঙ্কলিত 'কবিরাজ-ডাক্তার সংবাদ' প্রবন্ধে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক, পণ্ডিতপ্রবর আয়ুর্বেদ-বিশারদ, চিকিৎসা-নিপুণ স্বর্গীয় নীলাম্বর সেন কবিরাজ মহাশয় এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়া বৈদ্যক-চিকিৎসার উন্নতির সোপান সৃষ্টি করেন। পরে তদ্বংশীয়েরা আয়ুর্বেদের উন্নতি সাধনে যত্ন করিতেছেন।"

বর্তমানে বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে প্রধানত দুইটি চিকিৎসার ধারা বর্তমান—মুর্শিদাবাদ গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গাধর কবিরাজের একটি ধারা ও কলিকাতা কুমারটুলীর গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের আর একটি ধারা। শিষ্য-প্রশিষ্যক এই দুই গঙ্গার দুই অমৃতময় ধারার প্রবাহে আজ সমগ্র বঙ্গদেশ প্লাবিত।

"বাংলার আয়ুর্বেদ আকাশে উনবিংশ শতাব্দীতে দুইটি তারকা উদিত হ'য়ে বাংলা দেশকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। সে উজ্জ্বলা দুই ধারায় প্রকাশিত হোল। একটিতে সূর্য্যের কিরণ, আর একটিতে চন্দ্রের কিরণ যেন প্রতিভাত হ'য়ে উঠলো। গঙ্গাধর ও গঙ্গাপ্রসাদ দুই-ই এলেন নূতন প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে। বাংলার চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য রেখে এ দুজন ভারতীয় মূল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধার করলেন। তাঁরা আয়ুর্বেদীয় চিন্তাধারার মূল সূত্রটি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরলেন, সারা ভারতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার যে মালিন্য এসেছিল তাকে সুসংস্কৃত করলেন। গঙ্গাধর আয়ুর্বেদীয় সূত্রগুলি বৈদিক চিন্তাধারার অনুসরণে ব্যাখ্যা করলেন; আর গঙ্গাপ্রসাদ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতির জীবন্ত ধারা প্রবাহিত করলেন। ভগবান ধন্বন্তরির বংশধর গঙ্গপ্রসাদ তাঁর দেবোপম চরিত্রের আদর্শ নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

... ...

সে সময় পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসার প্রতিই স্থানীয় অধিবাসীগণ সবিশেষ ঝুঁকে থাকতেন, কিন্তু গঙ্গা-প্রসাদের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালী রোগে নিরাময়ের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে জনসাধারণের মন আয়ুর্বেদের প্রতি আকৃষ্ট হলো। দিনের পর দিন সে প্রতিভা আরও ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। সুন্দর মফঃস্বল বাংলাতেও তা প্রচারিত হ'তে লাগলো। গঙ্গাপ্রসাদের আর একটি অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশ হলো। তাঁর দয়া কেবল তাঁর স্বজনেই সীমিত হ'য়ে থাকলো না, সাধারণ মানুষের জীবনে সহজেই প্রবেশ করলো। সমাগত দরিদ্র রোগীগণ ক্রমে জানতে পারলেন—গঙ্গাতীরে গঙ্গার প্রসাদরূপে গঙ্গাপ্রসাদ এসেছেন—দরিদ্রের অন্ন, শিক্ষা, চিকিৎসা, পথ্য সবই এই গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে সহজপ্রাপ্য হয়ে র'য়েছে।.....

গঙ্গাপ্রসাদ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার মানকে বিলাতী চিকিৎসার সমপর্যায়ে উন্নীত করলেন। বৈদ্য-সম্প্রদায়ও তাঁর এই নবীন চেষ্টাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করলেন। প্রবলশক্তি ডাক্তারী চিকিৎসার বিরুদ্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে তাঁরা এতদিন সাহস করেন নি। গঙ্গাপ্রসাদের আন্তরিক দৃঢ়তা এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাকে অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত করবার প্রচেষ্টাকে তাই তাঁরা শুধু অনুমোদনই করলেন না, নিজেরাও তাঁর সহিত উন্নত মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন। জনসাধারণও ধীরে ধীরে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অন্তর্নিহিত অর্থ সহজেই উপলব্ধি ক'রে গঙ্গাপ্রসাদের মনোভঙ্গী অন্তরের সহিত গ্রহণ করলো। গঙ্গাপ্রসাদও সেই মতের পুনরাগতি দেখে ডাক্তারদের মত কবিরাজদেরও দর্শনী এবং ঔষধের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক মূল্যের ব্যবস্থা করলেন। গঙ্গাপ্রসাদের এই অভিনব পথকে গ্রহণ ক'রে কবিরাজগণ বাংলায় ডাক্তারী চিকিৎসার সমপর্য্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হ'তে লাগলেন। এই হচ্ছে চিকিৎসা জগতে গঙ্গাপ্রসাদের নব মানের সৃষ্টি।"

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ-লিখিত "দেশহিতৈষী কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন" প্রবন্ধ, হিমাদ্রি, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৬১—"দীনদশাপন্ন কবিরাজ সমাজের আত্মমর্য্যাদা পুনরুদ্ধার ও যুগোপযোগী সংস্কার সাধন তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান ব্রত ছিল। তিনি কবিরাজী বৃত্তিকে অর্থকরী না করিয়া গেলে আজ কবিরাজ সম্প্রদায় পাশ্চাত্য অর্থ-প্রাধান্য যুগে স্বদেশে ও সমাজে শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিতেন না। বর্তমানে যে সকল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ কবিরাজী চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহারা ঘুরে থাকিয়াই উহার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি দিতেন। অধুনা এক শুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে—ডাক্তার ছাড়িয়া অনেকে কবিরাজ ডাকিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুভ ফলও পাইতেছেন। আজকাল ভাল কবিরাজের আয়, ভাল ডাক্তারের আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। হিন্দুর চিকিৎসা হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী হওয়াই উচিত ইহা কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেই এক্ষণে বুঝিতেছেন।

কলিকাতা কুমারটুলীর সেই প্রবীণ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, ভারত প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়, কবিরাজতারাদল মধ্যে পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ। তাঁহার বয়স সত্তর হউক, কিন্তু চক্ষুদ্বয় এখনও নব যুবকের ন্যায় জ্যোতিষ্মান শুক তারাবৎ সদা যেন ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। এখনও তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতে সক্ষম, কোন নবীন পুরুষ সেরূপ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। বদন মণ্ডল হইতে প্রতিভা-লাবণ্য যেন সদাই ফুটিয়া পড়িতেছে। ইঁহারই সকল চিকিৎসায় আজ আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের উপর, কবিরাজ-কুলের উপর লোকের এত শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মিয়াছে।"

জন্মভূমি, মাসিক পত্র, চৈত্র, ১১৯৮ সাল,

৮ম সংখ্যা, ২৫৭ পৃষ্ঠা—

কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার গুপ্তপ্রসঙ্গে উক্ত। এইরূপ দীনহীন সম্প্রদায়ের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধার এবং সাধারণে প্রচলন অসম্ভব-প্রায় হইত। কোনও লুপ্ত বিদ্যার উদ্ধার করিতে হইলে তাহার জীর্ণ সংস্কার এবং তদ্বৃত্তিকে অর্থকরী ও সেই বৃত্তিজীবি সম্প্রদায়কে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন করা যুগ প্রবর্ত্তকের কার্য্য—ধন্বন্তরি-কুলরঞ্জন কবিরাজকুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ তাহা সুচারুরূপে সমাধান করিয়া গিয়াছেন।

(ক্রমশ)

আয়ুর্বেদমতে মূত্র পরীক্ষা পদ্ধতি

কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগীকে চিকিৎসা করিবার পূর্বে রোগীর নাড়ী, জিহ্বা, মূত্র, মল, নাসা, আস্য (মুখ), নেত্র, আর্তব প্রভৃতি পরীক্ষান্তে চিকিৎসার নির্দেশ দিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে মূত্রপরীক্ষার কথা বলা হইল—পরীক্ষার জন্য ভোরের সময় মূত্র গ্রহণ বিধেয়। রোগী প্রথম কিঞ্চিৎ মূত্র নিঃসৃত করিলে তাহার পর একটি নির্মল কাচপাত্রে মূত্র গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করা বিধেয়। মূত্রত্যাগের মধ্যম অবস্থার মূত্রই পরীক্ষাযোগ্য।

সূর্যোদয়ের পর অনাবৃত স্থানে ঐ মূত্র লইয়া মূত্রপাত্রটি পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত করিয়া তবে পরীক্ষা করিতে হয়।

পিত্তপ্রকোপ—মূত্র মধ্যে একবিন্দু তৈল নিক্ষেপ করিলে যদি বুদ্‌বুদাকৃতি ধারণ করে, তাহা হইলে পিত্ত প্রকোপ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

বায়ুপ্রকোপ—যদি বুদ্‌বুদাকৃতি না হইয়া ছায়া বিশিষ্ট হয় এবং সেই ছায়া দেখিতে স্নিগ্ধ শ্যাম বা রক্ত বর্ণ হয়, তাহা হইলে বায়ু প্রকুপিত হইয়াছে বুঝা যাইবে।

শ্লেষ্মাপ্রকোপ—যদি তৈল কিছু মূত্রের উপরি ভাগে সম্পূর্ণ ভাসমান অবস্থায় থাকে, প্রসারিত হইয়া না পড়ে এবং কর্দম জলবত (ঘোলাটে) হয়, তাহা হইলে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্লেষ্মা প্রকোপে তৈলবিন্দু নিক্ষেপের পর মূত্রাধারের দক্ষিণ দিকে মূত্র ছড়াইয়া পড়ে।

আমপিত্ত প্রকোপ—আমপিত্ত দোষে মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে সেই তৈল সরিষা তৈলবত বলিয়া মনে হয়।

বাতজ্বর—বাতজ্বরে মূত্র পাত্রের নিম্নে ঘনীভূত হয়—পিত্ত জ্বরে তৈলবত—বাতরক্ত দোষে রক্তবর্ণ, পিত্তপ্রকোপে কৈসুম্ভতৈলের ন্যায় মনে হয়।

অতিসার—অতিসারে মূত্রপাত্রের নিম্নে ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখায়।

জলোদর—জলোদর রোগে মূত্র ঘৃতকণাবত এবং জীর্ণজ্বরে ছাগমূত্র বর্ণ ধারণ করে।

ক্ষয়রোগ—ক্ষয়রোগ উৎপত্তিকালে মূত্রের কৃষ্ণবর্ণ এবং রোগী উক্ত রোগে সম্পূর্ণরূপে আক্রান্ত হইলে উহা শ্বেত বর্ণ দেখায়। এই অবস্থায় রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

সন্নিপাত—পিত্তপ্রকৃতি সন্নিপাতে মূত্রের উপরিভাগ পিত্তবর্ণ ও অধঃভাগ রক্তবর্ণ। বাত-প্রকৃতি সন্নিপাতে মূত্রের মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং কফ-প্রকৃতির সন্নিপাতে মূত্রের মধ্যভাগ শুক্ল বর্ণ হয়।

রসাধিক্যে মূত্র ও নেত্র ও পক্কর ইক্ষুরসসদৃশ বর্ণ ধারণ করে।

প্রসূতির দোষে মূত্র পীত বর্ণ প্রতিবিম্বের ন্যায় স্বচ্ছ, কৃষ্ণবর্ণ এবং বুদ্‌বুদযুক্ত হয়। নিরাম অবস্থায় উহা স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

উদরস্থ ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে মূত্র তৈল-সদৃশ স্নিগ্ধ অবস্থাপন্ন হয়।

মৃত্যু লক্ষণ :—

তৈলবিন্দু র্যদা ক্ষিপ্তো বুদ্বুদোর্দ্ধং ভবেত্তথা।
শ্বেতধারা মহাধারা পীতধারা মহাজ্বরঃ॥
রক্তধারা দীর্ঘরোগাঃ কৃষ্ণা চ মরণান্তিকা॥

শিশুপালন বিষয়ে প্রবন্ধ*

কবিরাজ শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভিষগ্‌রত্ন

বর্তমান মহাবিজ্ঞান যুগের কর্মব্যস্ত জগতে বিভিন্ন প্রকার সমস্যাগুলির মধ্যে "শিশুপালন" একটি অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শিশুপালন বিষয়ে প্রাথমিক হিসাবে মাতার অনিবার্য কর্তব্য থাকিলেও পিতার উক্ত বিষয়ে গুরু দায়িত্ব কোনও অংশে কম নহে। এক্ষেত্রে পিতা এবং মাতাকে মিলিতভাবে কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

"শিশুরা জগতের তথা দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ"—এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র স্বীকার করিলেই উদ্দেশ্য পালন হইবে না। শিশুরা যাহাতে শৈশবকাল হইতেই সুন্দর আদর্শমুখী শিশু-কল্যাণ কর্মসমাজের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহার জন্য যথোপযুক্ত নির্ভরযোগ্য পরিবেশ সংগঠন করিতে হইবে। এইরূপ দোষমুক্ত সর্বগুণসম্পন্ন আদর্শ সংগঠন-কার্যের পরিচালকহিসাবে শিশুদিগের নিকটে তাহাদের নিজ নিজ মাতাপিতাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও যোগ্য পরিচালক। সুতরাং প্রত্যেক মাতা-পিতাকে তাঁহাদের সন্তানসন্ততির জন্য দীর্ঘসূত্রতা ও আলস্য ত্যাগ করিয়া অধিকতর সক্রিয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা যাহাতে আয়ুর্বেদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখাই বিধেয়।

এইবার আমি "শিশুপালন" বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায় আলোচনা করিতেছি। শিশুর জন্ম হইতে তাহার শৈশবকাল কত বৎসর পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে তাহার একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ আবশ্যক। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী মহামান্য পণ্ডিত প্রবর চাণক্য শিশুদিগের শৈশবকালকে যে তিনটি পর্যায়ে বিভাগ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিতেছি, যথা—"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ; প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্র মিত্রবদাচরেৎ।" এখানে আমরা এইরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, প্রথম পর্যায়ে শিশুদিগের জন্ম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহাদের সহজাত সপ্ত প্রকৃতির অনুকূলে কৌমারভৃত্য তন্ত্রাদির মাধ্যমে এবং আধুনিক শিশুপালন বিজ্ঞানের সহায়ক একমাত্র স্নেহময়ী মাতার তত্ত্বাবধানে এবং বিজ্ঞ পিতার পর্যবেক্ষণে লালিত পালিত ও পুষ্ট হইবে। তাহার পর দ্বিতীয় পর্যায় লক্ষ্য করিলে এইরূপ মনে হয় যে, শিশুদিগের পাঁচ বৎসর বয়ঃকালের পর হইতে আরও দশ বৎসর পর্যন্ত মাতা-পিতার বাৎসল্য স্নেহ ও সতর্ক শাসনের গণ্ডির মধ্যে তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিশুসুলভ বুদ্ধি, মানসিক চিন্তাধারা, নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞানান্বেষ ও অভিজ্ঞতার আগ্রহ; আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, ক্রীড়া, পঠন, পাঠন, সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা, আদেশ-পালনে অভ্যস্ততা ও বাধ্যতা, সত্য কথা, সৎসাহস, পরিশ্রম, স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ়সংকল্প, বিনয়ী এবং সদা প্রফুল্ল ইত্যাদি বহুবিধ সদ্‌গুণের বিষয়ে যত্নসহকারে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর তৃতীয় পর্যায়ে

অর্থাৎ ষোল বৎসর বয়ঃকাল প্রাপ্ত হইলে পুত্র অর্থাৎ সন্তানগণের সহিত তাহাদের মাতা-পিতা বন্ধুর মত আচরণ অর্থাৎ সকল বিষয়ে আলোচনার সহিত সুপরামর্শ দান ও গ্রহণপূর্বক যাহাতে তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় এইরূপ বিষয়ে বাৎসল্য-জনোচিত নিঃস্বার্থ নির্দেশ দান করিবেন। সত্য কথা বলিতে কি, এই নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের মধ্যে শিশুপালনরূপ বিশাল বিজ্ঞান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাকারে ব্যক্ত করা এক প্রকার অসম্ভব। এখানে আমরা উহার উদ্দেশ্যমূলক আভাষমাত্র পাইলাম, ইহাই ধরিয়া লওয়া যায়। বিস্তৃত আলোচনায় এই বিষয়-বস্তুটি কত বিশাল তাহার সম্যক ধারণার জন্য নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল, আমার মনে হয় ইহার দ্বারা কিছু অনুমান করা যাইবে : (১) শিশুর স্বাভাবিক দেহের বৃদ্ধি, (২) মানসিক বৃদ্ধি, (৩) শিশুর দুধে দাঁত (৪,৫) স্থায়ী দাঁত ও দাঁতের যত্ন, (৬) শিশুর স্বেচ্ছামূলক কাজ কর্ম, (৭) শিশুর সাধারণ রোগ, (৮) পুষ্টির অভাবে শিশুর রোগ, (৯) দৃষ্টিশক্তির বিকাশ, (১০) শ্রবণশক্তির বিকাশ, (১১) শিশুর স্বাদ গ্রহণ করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা, (১২) তাহার গন্ধ গ্রহণের শক্তি, (১৩) শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয় বা ত্বক্, (১৪) শিশুর ভাষা, (১৫) বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, (১৬) আকৃতিগত পরিবর্তন, (১৭) দেহগঠনে শিশুর খাদ্য, (১৮) বিবিধ খেলার প্রয়োজনীয়তা, (১৯) দেহগঠনে নিদ্রার আবশ্যকতা, (২০) পোষাক-পরিচ্ছদ, (২১) স্নানের প্রকার ভেদ, (২২) ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির স্থান, (২৩) দৈহিক ও মানসিক বিকাশে অন্তঃনিস্রাবী গ্রন্থি, (২৪) যৌনচেতনা ও (২৫) শিশুর মানসিক গঠনে পরিবেশের স্থান। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আজ আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের কল্যাণে আমার সংকলন ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার যে সুযোগ পাইয়াছি তাহার জন্য সকল শুভার্থী ও হিতার্থীগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বারান্তরে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রাখিয়া এখানেই সমাপ্ত করিলাম।

ওঁ শান্তিঃ

---

* আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশন (১৩৭৪) উপলক্ষ্যে প্রসূতিতন্ত্র-কৌমারভৃত্য বিভাগে 'শিশুপালন' সম্বন্ধে লেখকের প্রবন্ধের অনুলিপি পূর্বেই প্রকাশিত হইল। আগামী ১৫ ফাল্গুন, ১৩৭৪, বুধবার, কলিকাতা—ইন্ডেন্টস্ হলে এই বিভাগের অধিবেশন হইবে।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

মনের উত্তেজনা ও তাহার প্রতিকার *

পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়

মনের খবর মানুষমাত্রেই রাখিতে চায়। এই মনের বিষয় অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষের জিজ্ঞাস্য। মানুষ সকলেই অজ্ঞাত ও জ্ঞাতসারে মনস্তাত্ত্বিক। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ যেন যদিও আকৃতিগত মিল আছে, মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই জিজ্ঞাস্য চলিতেছে।

জ্ঞানের প্রসারে বিজ্ঞানের চর্চায় এই মনস্তত্ত্ব—যাহা দর্শনশাস্ত্রের বিষয় ছিল—বর্তমানে তাহা বিজ্ঞানশাস্ত্র হইয়াছে। বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া, যেমন রসায়ণ-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। যেমন নাড়ীর স্পন্দন, রক্তের চাপ মাপা যায় সেই রকম মানুষের বুদ্ধির পরিমাণ করা যায়। কাহার জড় বুদ্ধি, কাহার সাধারণ বুদ্ধি ও কাহার অসাধারণ ও সাধারণ বুদ্ধি মনস্তাত্ত্বিক নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া শ্রেণীবিভাগ করেন।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে মন একাদশ ইন্দ্রিয়—মন রজ্জু ও বুদ্ধি সারথি। বুদ্ধির আদেশে মন ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালনা করে। আমার এই বিষয় আলোচনা করা একটা কর্তব্য বুদ্ধি ঠিক করিল, আর আমার পা আমাকে এই অধিবেশনে উপস্থিত করিল। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান শাস্ত্রে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহং এই সকল এক। মনের এত বিভাগ নাই। ভারতীয় দর্শনে মন ছাড়াও হৃদয় আছে। হৃদয়-বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি নয়—মস্তিষ্কের বৃত্তিও নয়। অনেক জ্ঞানীর মতে হৃদয়বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। মনের সম্পদ বড় সম্পদ। রাজা বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও মন অশান্তিভরা থাকে—তাহার বৃহৎ রাজত্বে সুখ নাই। শান্তি মনুষ্য জীবনে কাম্য। ইহা মনের উপর নির্ভরশীল। যদি কেহ সকল সময় মনে করে আমি দুঃখী তখন সে দুঃখী হইয়া থাকিবে। তাহার অপেক্ষা অনেক ব্যক্তি আর্থিক অবস্থায় হীন—তাহারা সুখে দিন কাটাইতেছে। অর্থ চোরে চুরি করিতে পারে। বিষয় লইয়া শত্রুতা—পরে বিষয় নাশ হইতে পারে, কিন্তু মনের সম্পদ মানুষ উন্মাদ না হইলে নষ্ট হয় না। আমার যদি সঙ্গীত সাধনা থাকে বা সাহিত্যচর্চা থাকে তাহা সহজে নষ্ট হইবে না। যে কোন জ্ঞানের চর্চার অভ্যাস অতি বার্দ্ধক্যেও থাকিয়া যায়। সাধারণ-ভাবে মানুষের মন ও দেহ—মানুষের মৃত্যুতে মনের ভয়, মনের বিকার, মনের সকল বেদনা, বাতব্যাধির বেদনার মত চলিয়া যায়। যে দেহে একটু রৌদ্রের তাপে কষ্ট, সেই দেহকে অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া দিলে সেই দেহ একটু নড়ে না। যাহারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, তাহারা ভাবে মানুষের মৃত্যুর পর শুদ্ধ সজীব দেহ থাকিয়া যায়। যাহার যেমন ভাবনা রুচি, পুনর্বার জন্মগ্রহণে সেই রুচি বা প্রকৃতি থাকিয়া যায়।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ অনেক আশ্চর্যজনক আবিষ্কার করিতেছেন—মানুষকে চক্ষু দান, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান, এমনকি, হার্ট তাহাও পাল্টাইয়া দিতেছেন। সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের মস্তিষ্ক পাল্টান মৃত্যুর সমান হইবে। মস্তিষ্ক অতীত জীবনের স্মৃতিভাণ্ডার। অতীত জীবন

প্রত্যেকরই পৃথক—কম বা বেশী। মস্তিষ্ক মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনের চঞ্চলতা জীবনে অশান্তির কারণ। চঞ্চল মনই নিকৃষ্ট সম্পদ জীবনকে বিড়ম্বিত করে।

উত্তেজনাই মনের চঞ্চলতা সৃষ্টি করে

বর্তমান যুগ যান্ত্রিক যুগ। মানুষকে অভাবের তাড়নায় এবং অনেক সময় অত্যধিক অর্থপিপাসায় যন্ত্রের মত করিয়া ফেলে। সামান্য একটু সময় দুই মিনিট কাল বায় করিয়া সৌজন্য রক্ষা করিতেও অনেকের সময় হয় না। দ্রুত খাদ্য গ্রহণ, দ্রুত স্নান, দ্রুত জীবন-যাপন অভ্যাস হইয়া যায়। ইলাস্টিক (Elastic) জিনিসের একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিলে ইলাস্টিসিটি (Elasticity) নষ্ট হইয়া যায়। মানুষের একটা অভ্যাসের সীমা আছে—পরে মানুষ অকর্মণ্য হইয়া যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয় ও হজমশক্তি কমিয়া যায়। অনেক সময় বিরক্তি হইতে এক প্রকার মনের রোগ সৃষ্টি হয়। আবার কামনার আঘাত বিরক্তির কারণ। সামান্য সামান্য বাসনার অপূর্ণতায় বিরক্তি—ক্ষুধার সময় একটু দেরীতে খাদ্য দানে বিরক্তি। এই রকমে সামান্য সামান্য বাসনার আঘাতে বিরক্তি ক্রমে বাড়িয়া যায়।

বর্তমান শহর-জীবন, বিশেষ করিয়া এই কলিকাতার সামাজিক পরিবেশ উত্তেজনাপূর্ণ—মহাকোলাহল, নানাভাবে বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিবাদ, শাসনরক্ষীর সহিত জনতার সংঘর্ষ, সাধারণ জীবন-ধারণ, রাস্তায় চলাফেরা বিপদসঙ্কুল। অনেক নিরীহ ব্যক্তির অঙ্গহানি, এমন কি জীবন-হানি হয়।

জনৈক বৃদ্ধের গুলিবর্ষণ শব্দে হার্টফেল করিয়া প্রাণ নাশ হইয়াছে। বৃদ্ধ ও স্নায়ুদুর্বল ব্যক্তির গুলিবর্ষণ শব্দে স্নায়ু দুর্বল করে। শহরে নানা উৎসব, মাইকের শব্দ ও আলোর ঝল্‌ঝলানি মানুষের সুস্থ জীবন নষ্ট হইয়া যায়। কর্ণ ও চক্ষু মানুষের প্রধান ইন্দ্রিয়। যত অভিজ্ঞতা এই চক্ষু ও কর্ণের সহায়তায়। আমাদের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা দ্বারা সভ্যতার প্রসার। চক্ষু ও কর্ণ ক্ষীণ হইলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়া যায়।

প্রাকৃতিক পরিবেশও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অতি গরমে মানুষের ক্লান্তি ও বিরক্তিবোধ—অতি-বর্ষণে ঘন ঘন বজ্রপাতে মনকে উত্তেজিত করে।

অবচেতন মন ও সচেতন মনের সংঘর্ষে উত্তেজনার সৃষ্টি। সামাজিক পরিবেশ ভাল, প্রাকৃতিক পরিবেশ ভাল—হঠাৎ মনে উত্তেজনা উপস্থিত। বহু পুরাণ বিদ্বেষ মনে জাগিয়া উঠিল। তাহা হইতে বিক্ষোভ ও বিরক্তির সৃষ্টি।

যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, যুক্ত চেষ্টা ও যুক্ত নিদ্রা মনের সমতা আনে। মনের বিশ্রাম শরীরের বিশ্রামের মত প্রয়োজন। আজকাল সকল স্থানে—বিশেষত শহরে নানা প্রকার ক্রিড়ার (ইন্‌ডোর ও আউটডোর) ব্যবস্থা আছে। এই ক্রীড়ায় যোগ দান করা বা এই ক্রীড়া দেখিয়া রস আস্বাদন করা, সমবয়সীর সহিত আলাপ করা, গল্প করা, গল্পের বই পড়া, সঙ্গীত শ্রবণ ইত্যাদিতে মনের বিশ্রাম হয়।

প্রাকৃতিক, সামাজিক প্রতিকূল পরিবেশে, বিশেষ করিয়া সভ্যদেশে মানুষের যৌবনে শরীর-চর্চা কঠোরতা পালনের শ্রেষ্ঠ সময়—কষ্ট স্বীকার করিয়া জীবনে জয়ী হইবার উপযুক্ত সময়। নিজে

স্বার্থপরের মত ভোগ না করিয়া পরোপকার বিষয়ে অভ্যাস জীবনকে দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ করে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ জাগান, সঙ্গীতে রুচি সৃষ্টি করা দরকার। অনেকের সংস্কৃতি-বিষয়ে রুচি থাকে না। অভ্যাস দ্বারা রুচির পরিবর্তন হয়, যেমন অনেক শিশু শিক্ষা করিবার জন্য বই পড়িতে চায় না—বই পড়িতে বিরক্তি। সেই শিশু অভ্যাসের দ্বারা একজন খ্যাতনামা শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে পারে। এইরূপ ভাবে নীতিবোধ, সংযম-শিক্ষা ও ধর্মভাব জাগান দরকার।

প্রবাদ—'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলীনত্বং ন মুঞ্চতি।' এই সকল প্রবাদের যুক্তি নাই। চেষ্টা দ্বারা অঙ্গারও হীরা হইয়া যায়। কয়লা ও অঙ্গার চাপে ও তাপে হীরা হয়। ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা বালুকণা—পরে মুক্তা হয়। বালির চাপে ও তাপে মুক্তার সৃষ্টি। তাপ অর্থ তপস্যা।

জ্ঞানের চর্চা উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনলাভের চেষ্টাও তপস্যা। তপস্যা তাপ বা দুঃখকে নিবারণ করে। কৃতিত্বলাভ, উচ্চ পদবীলাভ বা যশোলাভ শুধু কৃতিত্ব নয়, ব্যক্তির ধারাবাহিক চেষ্টা বা সাধনার কোন বিষয় কতদূর, তাহাই যথার্থ কৃতিত্ব। দেহের সমতা রক্ষা করা ও দেহের ত্রিদোষের আধিক্য নাশ করা প্রয়োজন—বায়ু, পিত্ত ও কফের আধিক্য হইতে ব্যাধি। ঋতুভেদে বাক্য-পরিবর্তন ও পরিচ্ছদ-পরিবর্তন সাধারণভাবে নিয়ম। বিশেষ উত্তেজনায় চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কর্তব্য।

মানুষের মঙ্গল-সাধন যত বেশী করা যায়, ততই জীবন সার্থক। আদান-প্রদান সমাজ-জীবনে চলিতেছে—চিকিৎসাবৃত্তি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। যাহারা এই বৃত্তি, অর্থই পরমার্থ নয়, এই হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহারা উচ্চ শ্রেণীর। যেমন বর্ণাশ্রমের মধ্যে ব্রাহ্মণ—উচ্চ বৃত্তির মধ্যে চিকিৎসাবৃত্তি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর চিকিৎসক ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। যাহারা ব্যবসায়-হিসাবে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করেন তাহারা বৈশ্য।* যে সকল চিকিৎসক চাকুরী করেন—যত বেশী তাহার দক্ষিণা হউক না কেন—যদি তিনি সিভিল সার্জেনও হন, তাহা হইলেও তিনি শূদ্র। পরের চাকুরী দাসবৃত্তি, মনের স্বাধীনতা থাকে না। পুরাকালে এই চিকিৎসাবৃত্তি সকল দেশে পুরোহিতের মধ্যে ছিল। এই জন্ম বা পূর্বজন্মের পাপের ফলে দেহের ব্যাধি। মূলত দেহ দেবতার মন্দির। কুকর্মের ফলে দেহে অসুস্থতা। যাহা রাখ তাহা অভিরাম—যাহা 'নেহি রাম' তাহা ব্যাধিরাম। ধর্মবোধই মানুষকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা দান করে।

---

* বিগত ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৭৮, বুধবার, কলিকাতা-ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত ৩৬তম বার্ষিক আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ সম্মেলনের 'কৃতবিদ্য—সমাজবিজ্ঞান বিভাগের' অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত।

—প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

অগদতন্ত্র

কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী

প্রথমেই ব'লতে হচ্ছে—বর্ত্তমান সমাজে আয়ুর্বেদ যে স্থান লাভ ক'রেছে, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমরা অন্যভাবে তার রূপ পরিগ্রহের আশা করেছিলাম। হয়তো বলা চলে খ্রীষ্টীয় দশম, একাদশ শতাব্দীর পর থেকে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসার গতি কুণ্ঠিত হয়ে র'য়েছে। মাঝে মাঝে কোন কোন প্রদেশে আয়ুর্বেদীয় মূল সংহিতা গ্রন্থ দু'টির উপর কিছু কিছু সংস্কৃত টীকা রচিত হয়েছে এবং সেগুলি ফলদ ভৈষজ্য বিদ্যারই কয়েকটি সংগ্রহগ্রন্থ। সেই রীতিটি বিংশ শতাব্দীতেও বর্ত্তমান, যেমন —বৈদ্যকুলভাস্কর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় গঙ্গাধর রায় এবং মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় গণনাথ সেনের রচিত দু'খানি প্রখ্যাত গ্রন্থ তার নিদর্শন। কিন্তু একথা মিথ্যা নয় যে, ঐতিহাসিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ আনুকূল্যে রক্ষিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা অমুক শতকে জনগণের একান্ত ছিল না। আজও সে অবস্থায় উত্তরবিশেষ হয়েছে কি? কয়েকজন বিখ্যাত চিকিৎসকের আবির্ভাবে আয়ুর্বেদের কিছু উপকার হয়েছে কি? আয়ুর্বেদের অমোঘ বিধান চিকিৎসার কয়েকটি ঔষধকে তাঁরা বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক'রে ধনী হয়েছেন। কিন্তু কোনদিন তাঁরা সরকারকে এবং জনসাধারণকে নমিত ক'রতে এমন কি, দলবদ্ধভাবেও আর ব'লতে পারেননি যে, আমাদের অভিজ্ঞতায় আপনারা বিশ্বাস করুন— অন্য বিদেশী চিকিৎসার পাশাপাশি ভৈষজ্যবিদ্যা ও শল্য-শালাক্য (Surgery) বিদ্যার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ সমশক্তির আধার। তারপর স্বাধীনতা লাভের পরে শাসনক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দের আচরণে এমনও দেখা যাচ্ছে না যে, তাঁরা আয়ুর্বেদের শল্য-শালাক্য বিদ্যায় ও ভৈষজ্য বিদ্যায় অটুট আস্থাবান্। বরং বিপরীতই দেখা যায়। তাই আজকের দিনে "অগদতন্ত্রের" মত আয়ুর্বেদের এক বিশাল অঙ্গকে শুধু বিচার বিশ্লেষণের নিবন্ধ তত্ত্বেই আলোচনা ক'রতে হচ্ছে। কারণ, অগদতন্ত্র ব'ললেই অনেকের কাছে ও শব্দটি ধাঁধার বিষয় বলে মনে হয়। গদ মানে রোগ আর অগদ মানে নীরোগ অবশ্যই হয়। ফলত অগদতন্ত্রের অর্থ হয় "কায় চিকিৎসা।" যেমন সুশ্রুত শালাক্যতন্ত্র প্রসঙ্গে বলেছেন—

'প্রতিষ্ঠায় নিষেধশ্চ শিরোগদ বিরেচনম্।
চিকিৎসা তদ্ গদানাং চ শালাক্যং তন্ত্রমুচ্যতে।'

এখানে গদ মানে রোগ, তারপর সেই সূত্রস্থানেই—

'সংবিজ্ঞানার্থং অধ্যায়া গদানাং তু প্রতি প্রতি'

অর্থাৎ প্রতি অধ্যায় এবং প্রতিটি রোগের জন্য তারপর ঐখানেই বলেছেন—

'প্রতিষেধ নিষেধশ্চ শিরোগদ বিরেচনা।'

অতএব সর্বসাকুল্যে পাওয়া যাচ্ছে, গদ মানে ব্যাধি আর অগদ মানে নির্ব্যাধি। সেইজন্যেই প্রসিদ্ধি আছে—চিকিৎসকের পারিভাষিক শব্দ "অগদকারঃ, রোগহারী, ভিষক্ বৈদ্যঃ" ইত্যাদি। রাজনির্ঘণ্টুকার তাই বলেন। অর্থাৎ অগদকার মানে হচ্ছে—a physician, তা'হলে অগদতন্ত্র বললে

চিকিৎসাশাস্ত্রই অর্থ হয়। যদি তাই হয়, তবে চরকসংহিতা, বাগভট, ভবপ্রকাশ সবই হয় "অগদতন্ত্র।" আর যাঁরা বলেন—সুশ্রুতের আগে চরকসংহিতার নির্মাণ। তা'হলে তাঁরাই বেশী ধাঁধায় পড়বেন কারণ, চরকের কোথাও কি আছে যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসার একটি অঙ্গ "অগদতন্ত্র?" চরক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের বিষয় নির্বাচন যেভাবে করেছেন তাতে—(১) সূত্রস্থান, (২) নিদানস্থান, (৩) বিমানস্থান, (৪) শারীরস্থান, (৫) ইন্দ্রিয়স্থান, (৬) চিকিৎসাস্থান, (৭) কল্পস্থান ও (৮) সিদ্ধিস্থান। এদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বললে যা বোঝা যায় তা' নিতান্ত কষ্টকল্পিত, আর তাতে তা' নাইও। কিন্তু চরক চিকিৎসাস্থানে অগদ শব্দটি কয়েকবারই ব্যবহার করেছেন তাতে অগদ মানে নীরোগ একথা বোঝা যায় না। যেখানে পাওয়া যায় সেখানে বিষরোগের এক একটি মহৌষধ সহজেই পাওয়া যায়। তাতে সহজেই মনে হয়—অগদ শব্দটি চিকিৎসাশাস্ত্রের নিজস্ব পরিভাষা। সেই পরিভাষা রচনা করেছিলেন সুশ্রুত। তিনি গদ মানে রোগ একথাও যেমন বলেছেন, আবার অগদ মানে যে বিষসম্পর্ক তাও ব'লেছেন। সেক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ দৃঢ়ভাবে বলতে পারেন যে, চরকের বহু আগেই সুশ্রুত এবং সেই সুশ্রুতেরই নির্দেশ—অষ্ট অঙ্গসম্পন্ন আমাদের আয়ুর্বেদ। সেই আয়ুর্বেদের বহু অঙ্গ অগদতন্ত্র। অগদতন্ত্র মানে—"সর্প-কীট-বৃশ্চিক-মূষিকাদিদষ্ট বিষব্যঞ্জনার্থং বিবিধ-বিষসংযোগ বিষোপহতোপশমনার্থম্।"

এই অগদতন্ত্র একদা বহু শাখায় বিভক্ত হ'য়েছিল। সুশ্রুত নিজেই স্বীকার করেছেন—

'অধ্যায়ানাং শতং বিংশমেবমেতদথৌষিতম্।'

এই অগদতন্ত্রের বিষয়টি বস্তুবাদে এবং মনোবাদেও নিবদ্ধ। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে বিষ অনন্ত বললেই হয়। তবুও সুশ্রুত তাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে বলেছেন স্থাবর বিষের আধার দশপ্রকার, আর জঙ্গম বিষের আধার ষোলপ্রকার। আধারগুলিকে কিন্তু ওই সংখ্যায় সংখ্যাত করা চলবে না। তা'ছাড়া যোগজ রূপও তাদের বহু। মোট কথা, অগদশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা অত সহজ নয়। বিষশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হ'লে প্রাচীনযুগে তাকে বিষবৈদ্য বলা হোতো; সেইজন্য বৈদ্য বলা শব্দটির ব্যাপক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ ছিল। পদ্মপুরাণে তা' বলা হ'য়েছে—

'বেদে মন্ত্রে চ ভৈষজ্যে দৈবে আয়ুর্বলে বিষে।
বৃক্ষে তে পশুপে চৈব বৈদ্যাঃ লোকপ্রপূজিতঃ॥'

অর্থাৎ বেদের সংহিতা গ্রন্থ যাদের আয়ত্তে থাকতো তা'দিকে বেদবৈদ্য মন্ত্রে বিশেষজ্ঞ হ'লে তাঁকে মন্ত্রবৈদ্য। এই শ্রেণীর বৈদ্য ছিলেন—বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, অগ্নিবেশ, বৈশ্বানর, সৌনক ও ঔপধেনু ইত্যাদি। এঁরা দু'টি বিদ্যাই বিশেষ ভাবে জানতেন। তা'ছাড়া সেকালে আয়ুর্বৈদ্য, জ্যোতির্বৈদ্য, বিষবৈদ্য, পশুবৈদ্য, বৃক্ষবৈদ্য ইত্যাদি পৃথক পৃথক শ্রেণীর বৈদ্য ছিলেন। হয়তো এঁরাই ছিলেন এসব ক্ষেত্রে পারদর্শী (Specialist)।

সুশ্রুত নিজের গ্রন্থটিকে অষ্টাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেও শল্য-শালাক্য তন্ত্রটিকেই বিশেষভাবে বর্ধিত করেছেন। অন্যগুলিকে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে রচনা করেছেন। কারণ—সুশ্রুতের আসল বক্তব্য অগদতন্ত্র নয়।

সুশ্রুতও একজন প্রতিসংস্কর্তা; অর্থাৎ তাঁরও পূর্বে রচিত ধন্বন্তরি কশ্যপ প্রভৃতি মুনিদের রচিত গ্রন্থ ছিল, সেগুলি কালক্রমে জীর্ণ হয়ে যায়। সুশ্রুত তারই মধ্যে শল্য শালাক্য বিদ্যাটিকে

সংস্কার ক'রেছেন ; তাই অগদতন্ত্রটিকে খুব সংক্ষেপেই তাঁকে ব'লতে হয়েছে। তাই এর টীকাকার ডল্লন ব'লেছেন—'মূলাদি বিষাণাং যত্নপরৈরপি জ্ঞাতুং অশক্যত্বাৎ তানি হিমবৎপ্রদেশে কিরাত-শবরাদিভ্যো জ্ঞেয়ানি।' অর্থাৎ, অগদতন্ত্রে উল্লিখিত স্থাবর জঙ্গম বিষগুলিকে অনেক চেষ্টা করেও জানা যায় না। ওগুলি হিমালয়ের অধিত্যকা উপত্যকাবাসী পশুপালক ও নিম্নবর্ণদের কাছে জানা যায়। সুশ্রুতের অন্যতম প্রাচীন টীকাকার গয়ী বলেছেন—

'প্রোক্তং অগদতন্ত্রে যৎ স্থাবরং জঙ্গমং বিষম্।
যথা কথঞ্চিৎ বিজ্ঞেয়ং পশুপাদ্ স্থবরাদ্ ক্বচিৎ॥'

এতে বেশ বোঝা যায়—আমাদের শল্য-শালাক্য বিদ্যাটি যেমন অনেকক্ষেত্রে উচ্চ বর্ণের অবহেলিত জাতি মাল, নাপিত প্রভৃতির হাতে রক্ষা পেয়েছিল, তেমনি সেগুলির অস্তিত্বের নমুনা আজও কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। অগদতন্ত্র বিদ্যাটিও গয়ী, জেজ্জট, ডল্লনের যুগে পাহাড়িয়াদের হাতে তার কিছু কিছু ব্যবহার ছিল। সুশ্রুত অগদ শব্দটি বহুবার ব্যবহার করেছেন, যেমন—

'মহাসুগন্ধিং অগদং যং প্রবক্ষ্যামি তং শিবক্
পানলেপননস্যেষু বিনীতাঞ্জনেষু চ।

তা'ছাড়া মধু এবং ঘি-এর সমতা যে একটি অগদ তাও বলেছেন, যেমন—

ক্ষৌদ্রঘৃক্তোঽগদো জ্ঞেয়ঃ দূষীবিষমপোহতি।
নান্যা দূষীবিষারিষ্ট সাম্যং তৎ বীর্য্যতঃ ভবেৎ॥'

এবং সে দু'টি বিষের ক্ষেত্রে বীর্যপ্রভাবেই কাজ করে। তারপর, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যোয়ান, হিং, ত্রিকটু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি একত্র মিশিয়ে সেই সূক্ষ্ম চূর্ণ-যদি ক্রিমিজন্য অজীর্ণ বিষে ব্যবহার করা যায়, তাহলে সেই ঔদরিক বিষ অচিরেই দূর হয়—'একোঽগদঃ স্থাবরজঙ্গমানাং জেতা ভবেচ্চাপি বিষে অজীর্ণে।'

সুশ্রুত অগদ শব্দটিকে একদিক দিয়ে একটি বিষবাচক রূঢ়ি অর্থে প্রয়োগ ক'রেছেন; আবার যোগজ অর্থেও প্রয়োগ ক'রেছেন। যেখানে আহার-বিহারের দোষে এবং দেশ-কাল-বয়সের তারতম্য বিবেচনা না করে ঔষধ প্রয়োগ করলে যে চিকিৎসা-সংকট হয়, সেখানেও অগদ অর্থাৎ ঔষধ অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবার কতকগুলি বিষধর প্রাণীর দংশন স্পর্শনের ফলে শরীরের যে বিষক্রিয়া হয় এবং তা প্রথম দ্বিতীয় স্তরে দৈহিক প্রতিক্রিয়ার বেগ দেখা দেয় সেক্ষেত্রেও—'অগদং মধুসর্পিভ্যাং পায়য়েৎ যুক্তিপূর্বকম্' বলে অগদ শব্দের ব্যবহার করেছেন।

সুশ্রুত তাঁর গ্রন্থে অগদ এবং অগদতন্ত্রটি যে নিবদ্ধ করেছেন তা' সম্পূর্ণ নয়। আজ পর্যন্ত অগদতন্ত্র' নামে কোন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। মহামতি চরকও তাঁর বিশাল সংহিতা গ্রন্থের মধ্যে বিষচিকিৎসাপ্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলেছেন তাও সুশ্রুতের একটি স্থানের বিশেষ আদর্শ নিয়ে। কারণ, সুশ্রুত মোটামুটি সকলপ্রকার বিষেরই অগদ বা ঔষধের অনুধাবন করেছেন। চরকে একমাত্র সর্পবিষ সম্বন্ধেই বেশী করে বলা হয়েছে। আর অন্যান্য বিষ সম্বন্ধে ঔষধের ফলশ্রুতি দিয়ে কয়েকটি বিষের উল্লেখ করেছেন। তবে সুশ্রুতের অগদ শব্দটিকেই বিষহরত্ববাচী বলে ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন—'অনেন সত্যবাক্যেন সিধ্যতাম্ অগদো হয়ম্।' চরকের এই বিষচিকিৎসাপ্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ লক্ষ্য করবার আছে। ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যখন প্রতিষ্ঠিত সেইসময়ে

কপিঞ্জলের অভ্যুত্থান এবং তাঁরই সভাপণ্ডিত কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত পক্কনদবাসী মহর্ষি কপিলবল 'চরক' উপাধি লাভ করেন এবং প্রাচীন অগ্নিবেশ সংহিতাখানির প্রতিসংস্কার করেন। (৭) সেই সংস্কারের সময়ে বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপ ভারতে আর্যবংশধরদের বন্দনীয় হয়ে চিকিৎসাগ্রন্থেও স্থান পেয়েছিলেন। তাই চরক-সংহিতায় বিষচিকিৎসা প্রসঙ্গে 'মহাগন্ধহস্তী' নামক অগদটির নির্মাণকালে যে মন্ত্রটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে দেখা যায়—

নমঃ পুরুষসিংহায় বিষ্ণবে বিশ্বকর্মণে।
সনাতনায় কৃষ্ণায় ভবায় বিভবায় চ॥

চরক যে কয়টি (১) গন্ধনামা অগদহস্তী, (২) মহাগন্ধনামা অগদহস্তী, (৩) ভাবাগনামা অগদহস্তী প্রভৃতি বিষঘর ঔষধের প্রবর্তন করেছেন,প্রত্যেকটির নামও অগদ পদ দিয়ে।

সুশ্রুত ও চরকের কাল নির্ধারণে তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যায় 'অগদতন্ত্র' সম্বন্ধে সুশ্রুত যত বলেছেন,চরক তত বলেননি।

হয়তো অগদতন্ত্রগুলি তখনকার দিনে সুপ্রাপ্য হয়নি, অথবা চরকের মূল বক্তব্য যখন কায়চিকিৎসা, তখন বিষতন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজনই হয়নি। এর ফলে আমাদের ভাগ্যে অগদতন্ত্রের পূর্ণ আকার আর দেখা হোল না। আর সুশ্রুতের ক্ষেত্রে শরীরের প্রাত্যক্ষিক উপাদান নির্ণয় এবং তার পরিচয় জানার সংগে শল্য-শালাক্য তন্ত্রটির যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী জানানো যখন বক্তব্য নয়, তখন ঐ তন্ত্রটির বেশী অন্য তন্ত্রটির আলোচনায় বিশদ করারও প্রয়োজন হয়নি।

বুদ্ধদেবের সময় জীবক নামে এক বৌদ্ধসন্ন্যাসী (Buddhist monk) প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্ ছিলেন ব'লে জানা যায়। [ত্রিপিটক, বুদ্ধচরিত] তিনি সুশ্রুতের অস্ত্রচিকিৎসার ধারাটিকেই আয়ত্ত করেছিলেন। তবে এ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এবং অন্য কোন তন্ত্রের প্রচলন ছিল বলে জানা না গেলেও ধরে নিতে হয় সৌশ্রুতী বিদ্যা' প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু অগদতন্ত্র যে তখন প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সৌশ্রুতীবিদ্যার অন্তর্গত অগদতন্ত্র ইহা যখন বোঝা যাচ্ছে, তখন অবশ্যই বুঝে নিতে হচ্ছে এই তন্ত্রটি বহু প্রাচীন যুগেই খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। সুশ্রুত তাঁর গ্রন্থে সে তন্ত্রের যথেষ্ট সংস্কার করেছেন। তাই তাঁর গ্রন্থে মাঝে মাঝে প্রাচীনতম মতেরও অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তবে প্রাচীন গ্রন্থ-হিসাবে এক সুশ্রুতেই আমরা অগদতন্ত্রের উল্লেখ পাই এবং বিষ-সংক্রমণের ও চিকিৎসার একটি মোটামুটি পরিচয়ও পাই। একাদশ, ত্রয়োদশ শতকের চক্রপাণি এবং শিবদাস চরকেরই অনুসরণ ক'রেছেন এবং অগদনামও ব্যবহার করেছেন—

এষোঽগদঃ হস্ত্যপযুজ্যমানঃ পানাঞ্জনাভ্যঞ্জন-
নস্যযোগৈঃ।
অবার্য্য বীর্য্যো বিষবেগ হন্তা মহাগদো নাম
মহাপ্রভাবঃ॥'

শিবদাস চক্রপাণির টীকায়ও বাগ্‌ভটের এবং বৃন্দের কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেউই পৃথকভাবে অগদতন্ত্রের উল্লেখ করেননি। এই প্রসঙ্গের অন্তরঙ্গ ভাষায় বলা যায় যে সুশ্রুত বিষতন্ত্র বা অগদতন্ত্রটির যে রূপদান করেছেন এবং তন্ত্রন যে অবর জাতি ও পত্তপাঅকদের কথা বলেছেন তা যদি আজ রাষ্ট্রের অনুমোদিত কোন

প্রতিষ্ঠানের অধীনে থেকে পূর্বের তন্ত্রটির এবং তাদের উপদেশগুলির পুনরুজ্জীবন করা হয়, তবে নিশ্চয়ই দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের আরেকটি দিক্ উজ্জীবিত হবে। বিহার ও বাংলার সংযোগস্থলে নেপাল, দার্জিলিং, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে এখনও এমন প্রাচীন জাতির বংশধর রয়েছেন, যাঁদের পুরুষানুক্রমে বিষচিকিৎসার নানা ঔষধ জানা আছে। সেগুলিকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাতেও অগদতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন হবে।

এই প্রসঙ্গে অগদতন্ত্রসম্বন্ধে আরও স্মরণীয় বিষয় যুক্ত করা প্রয়োজন। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সংহিতাগুলির মূল উৎস অথর্ববেদ। সুশ্রুত ও চরক দৃঢ়ভাবে তাই ব'লেছেন। অতএব অগদতন্ত্রটির উৎসও অথর্ববেদ।

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের মনীষীবৃন্দের মধ্যে এমন ভ্রমও দেখা গিয়েছে যে, তাঁরা আমাদের বিষচিকিৎসার ব্যাপারে সংহিতা-গ্রন্থোক্ত বিষয়গুলিকে ভারতের আদিবাসীদের আদিম পদ্ধতি বলেছেন। কিন্তু তাঁদিগকে জানিয়ে দিলে এই কথাই বলা হয় যে, আমাদের বৈদিক সংহিতা গ্রন্থগুলি তাঁদের খৃষ্টীয় সভ্যতা বিকাশের আদিকাল মাত্র সপ্তম শতাব্দীর পরে নয়, তারও বহু সহস্র বৎসর পূর্বের এবং সভ্যতা ভারতে এসেছিল খৃষ্ট জন্মের আড়াই হাজার বৎসর আগে। যেদিন বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেদিন তার পরিধি শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র এশিয়া এবং ইউরোপের প্রান্তদেশগুলিকে নিয়ে। ইউরোপীয় সভ্য সমাজের মধ্যেও সেই ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার বিকাশকে তাঁরা ধ'রে রেখেছেন, সে সম্বন্ধে উইন্টারনিজ তাঁর পুস্তকে বলেছেন—

"Among the Indians of North America among the Negro races of Africa, among the Malayas, among the ancient Greeks and Romans and frequently still among the peasantry of presentday Europe, we find exactly the same views, exactly the same strange lips of thought in the magic songs and magic rites as have come down to us in the Atharva veda of the ancient Indians. There are then numerous verses in the Atharva veda which, according to their character and often also their contents, differ just as little from the magic formulas of the American-Indian's medicine.……

Bone to Bone
Blood to Blood
Limb to limbs
As if they were fluid

আফগানিস্থান ও উত্তরকৌস্থান তো দূরের কথা, ভারতবর্ষে সে সভ্যতার বিকাশ হয় ঢের পরে। হর্ষাশ্ব বর্ষ, (বর্তমান চীন) ইলাবৃত বর্ষ, (স্বর্গ) তাকলামাকান্, পূর্বতুর্কীস্থান—এগুলি ছিল স্বর্গভূমি। কালের প্রবাহে তা' ক্রমে হয়ে গিয়েছে মরুপ্রান্তর। সেখানের জনতা ছিলেন স্বর্গবাসী এবং তাঁদের জনপদ স্বর্গ আখ্যা পেয়েছিল। আয়ুর্বেদ সেখান থেকেই বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আয়ুর্বিজ্ঞান পত্রিকায় করেছি)। তা যাই হোক্, সেই স্বর্গভূমিতে যে অথর্ববেদের বীজ অঙ্কুরিত হয়, তারই পূর্ণ বিকাশ হয় ভারতে। সে সময় ভারতের ভূমিজ, খনিজ, উদ্ভিজ, প্রাণীজ প্রভৃতি প্রাকৃত দ্রব্যগুলির রস বীর্য প্রভাবের অনুশীলন হয়েছিল—সেই অনুশীলনেরই একটি অধ্যায় "অগদতন্ত্র"।

তাই আমরা অথর্ববেদের প্রতি শাখায় শাখায় মন্ত্র ও দ্রব্যবিজ্ঞানের উল্লেখ পাই। দু'চারটি উদাহরণ দিই—দ্বিতীয়কাণ্ডের যেখানে অনুবাকগুলির যে কয়টি সূক্ত রয়েছে তা'তে বেণ রাজা এবং অদিতির প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে নষ্টদ্রব্য বিজ্ঞান, কুমারীর সৌভাগ্য-বিজ্ঞান, কাম্পীল বৃক্ষের (কমলা গুঁড়ি) ত্বক্-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তার পরবর্তী অনুবাকে লাক্ষা (রোহিণী), কেশর্ত (কেশিনী) ইত্যাদির দ্রব্যশক্তি এবং প্রয়োগবিজ্ঞান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যেমন—

রোহিণী। অসি। রোহিণী অস্রঃ
ছিন্নস্য। রোহিণী।
রোহয়। ইদং। অরুরুহি।

অর্থাৎ হে রোহিণি! তোমার অঙ্গ আমাকে দাও। তোমার অঙ্গ-নিষিক্ত শোণিত-বারি আমাদের শোণিত বর্দ্ধন করুক। তোমার মজ্জা আমাদের ভগ্নদেহ সংযোজিত করুক। তোমার মেদ আমাদের ক্ষতস্থান সন্ধান করুক, ইত্যাদি।

রোহিণী মানে লাক্ষা। আজও আমরা সেই লাক্ষা দ্রব্যটির ব্যবহার বিশেষ প্রকারেই করে থাকি, এবং ঐসব ক্ষেত্রেই ক'রে থাকি।

তারপর রিষ্ট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

যং তে রিষ্টং যং তে ত্বাতঃ অস্তি প্রেষ্টং তে।
আস্থনি ধাতা তৎ ভগ্নস্য পুনঃ সম্ ভবং পরুষা পরু।

এখানে লাক্ষার পর পরুষ বৃক্ষকে (ফলসা) বিশ্লেষণ করেছেন। ফল্‌সা গাছের ছাল, তার পাতা তার ফল আমাদের দেহে সংক্রামিত বিষকে নাশ করে এবং ভগ্নস্থান সংযোজিত করে। সেইরূপ শিরীষ, ওগরপাদুকা প্রভৃতি ভৈষজ্যগুলির সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। কোথাও রিষ্ট অর্থ ভাঙ্গা, কোথাও মন্ত্র, কোথাও দ্রব্যের অংশবিশেষ ইত্যাদি অর্থে ভৈষজ্যগুলিকে সম্বোধন করা হয়েছে।

অতএব অগদতন্ত্রটির উদ্ভবস্থান অথর্ববেদ। আমাদের ভারতে অথর্ববেদের এই অগদতন্ত্রের প্রচার ও প্রসার এতদূর হয়েছিল যে, আজও ভারতের আদিবাসী এবং গ্রাম-জনপদবাসীদের মধ্যে সেই অগদতন্ত্রটির নানাভাবে পোষণ হ'য়ে আসছে। তাঁদের এ ব্যবহার সর্বজন-প্রত্যক্ষে ঘটে। এমন কি, বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সাপ, বিছে, মাকড়সা, ইন্দুর প্রভৃতির দংশনে সেই অগদতন্ত্রের পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে আসছেন। তাগা-বান্ধা, শিকড়ের রসের নস্য নেওয়া, কোন গাছের ছাল-পাতা প্রভৃতি অংশগুলি বেটে প্রলেপ দেওয়া, তেল-ঘির সঙ্গে গাছ-গাছড়ার রস পাক করে বিষাক্ত ক্ষতে লাগান—সবই অগদতন্ত্রের পদ্ধতি গ্রহণ।

সুশ্রুতের সময় অগদতন্ত্রের প্রচার যেখানে যতটুকু ছিল, যতদূর সম্ভব তা অনুসন্ধান ক'রে সুশ্রুত নিজের সংহিতায় তাকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

তিনি অগদতন্ত্রের পদ্ধতিগুলিকে এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—

অরিষ্টবন্ধঃ পরিচূষণং চ, দাহশ্চ, দংশে ফলমূলকে চ
বস্ত্রীকলেপঃ, পরিষেচকশ্চ, ঘৃতং চ তৈলং বমনং তথা চ
পথ্যং চ নিদ্রা সুখ জাগরশ্চ তন্ত্রে যথোক্তোক্ত
বিধিরিষ্যতে যাদৃক্।
ক্ষারাগদঃ, মন্ত্র শিরীষযোগাঃ স্বেদোবিধেরোজ্বথবা
বিকল্পঃ।
নস্যাঞ্জনাভ্যঞ্জন পানধূমাঃ তথাবপীড়ং কবল গ্রহশ্চ
সংশোধনং চোত্তরতঃ প্রধানং কুর্যাদ্
শিরোমোক্ষণমেবচাগ্র্যং।

অর্থাৎ বিষধর সর্প ও যে কোন জঙ্গমের বিষ শরীরে সংক্রামিত হলে অথবা স্থাবর বিষের সংযোগে

প্রতিক্রিয়া হলে এই পদ্ধতিগুলির যে কোন একটি বা সবগুলির আশ্রয় গ্রহণ করবে—

ভাগা বাঁধা, রক্ত চুষিয়ে দেওয়া, ছ্যাকা দেওয়া, কোমল কলমূলে কামড় দেওয়া, উই মাটি প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া, ঘুষিয়ে দেওয়া, ঘৃত তৈল প্রভৃতির মলম দেওয়া, বমি করান, ক্ষার ও অগদ ব্যবহার করা, মন্ত্র বলা, শিরীষ প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল বেটে লাগান, স্বেদ দেওয়া, অথবা স্বেদরোধ করা, নস্য দেওয়া, নিদ্রা করান কিংবা জাগান, ভেষজ দ্রব্যের নস্য দেওয়া, কাজল করা, ধূপ প্রয়োগ করা, শুঁকিয়ে দেওয়া, কোন ভেষজ দ্রব্যের গ্রাস দেওয়া, শোধন করা, রক্ত মোক্ষণ করা। এই হোল অগদতন্ত্রের পদ্ধতি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এলে আমরা অবশ্যই তাতে মনোনিবেশ করতে পারবো বলে আশা করি। মোট কথা, অগদতন্ত্রটি লুপ্ত হয়নি, তবে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে—ভারতে এবং বহির্ভারতেও। এমন কি, একথাও নিঃসঙ্কোচে বলা যায়—বিশ্বের চিকিৎসার উন্নতি ও নিত্য নূতন গবেষণার মূলে রয়েছে ভারতের "অগদতন্ত্র"।

বিজ্ঞান বিভাগ

Research in Ayurveda

Kaviraj Dr. Prabhakar Chatterjee, M.A. Ayurveda-Brihaspati

Now-a-days, almost everybody from a coblet on the street to a Chief Minister of a State speaks of there being no research in Ayurveda. And he speaks of it in such an authoritative tone and confidence as if he has gone through the whole lot of more than five thousand published and unpublished books of Ayurveda in fourteen principal languages of India in her sixteen states. Even remarks like riding on a bullock cart with a view to reaching a distant place, instead of on a motor car or a plane are often uttered by modern men about a person when he is found to having recourse to an Ayurvedic method of treatment with a view to curing his disease. And a separate charge is very often levelled against the Ayurvedists that they have not been able to keep pace with the progressive movement of time requiring frequent changes of nature of medicines for the treatment of the same disease in different forms in different persons in different climates and places of the world which have come closer to one another due to the conquering of time and space by radio and aviation.

Another charge made against the Ayurvedists is that they are not possessed of the practical experience born of a closer association with patients who have been hospitalised in the departments of minor and major surgery, obstretrics, Gynæcology, Emergency and Infectious diseases.

Want of facilities for the dissection of the dead bodies in the curriculum of studies for the students of Ayurveda taking instructions in the Ayurvedic Tols or similar institutions is another very grave charge levelled against the Ayurvedists belonging to the old school of Ayurvedic education insinuating inefficient and inadequate anatomical knowledge necessary for proper and accurate knowledge of the science of Ayurveda on the part of the practising Ayurvedic physicians.

The gravest possible charge made against them is that they have been using the same medicines and the same methods of treatment ever since the post-Vedic ages when Agnibesha and Dhanvantari wrote their first works on Ayurvedic medicines and surgery. As such Ayurveda is lying in a static and stagnant condition like the water of a river whose flowing and current have been chocked up by the deposit of silt and parasites upon it causing the water inside turbid and putrified, sheltering worms, snakes and crocodiles in the shape of quacks and inefficient Vaidyas incapable of catering to the health services of the people of India.

Moreover, there is no specialised study in the different branches of the science of Ayurveda. A single physician deals with all cases of medicines and surgery. And they are incapable of dealing with the problem diseases of the modern scientific world such as, T.B., Cancer, Heart diseases, Low Blood pressure, High blood pressure, Coronary and Cerebral Thrombosis and Arthritis and the so-called new diseases of the modern city life such as Typhoid, Meningitis, Cholera, Small Pox, Plague, Encaphelitis, Flue, Jaundice, Chronic Dyspepsia, Amebiosis etc. entailing an advanced knowledge of modern hygiene and town planning, Aviation, Civil and Military Engineering, Aeronautical Engineering, Railway Engineering, Electrical and Mechanical Engineering, Mines, Metals and Fuel Engineering, Agricultural Engineering, Radio Engineering and Accident and Epidemics in large industrial concerns and power plants. As such an acquisition of proficiency in the treatment of diseases arising out of the above-mentioned concerns of the modern times is absolutely necessary on the part of a physician who will be capable of successfully practising in the present industrial setup of affairs in the world.

A modern man thinks that an Ayurvedic physician, because of his conservative · outlook on life and ignorance of the problems in connection with the above organizations of the modern social life which is advancing with an overwhelming and unprecedented speed, is incapable of

tackling with the complicated problems of modern diseases.

Moreover, Ayurvedic medicines are prepared according to old methods of Hindu Chemistry in which distasteful medicines in crude forms and heavy quantities are given to the patients for treatment which deter them from taking Ayurvedic treatment. The difficulty in procuring suitable accompaniments with which medicines are in most cases to be taken, is another formidable impediment to the popularity and progress of the method of treatment among the patient community. Want of suitable containers for the preservation of the medicines inspiring confidence in minds of the patients regarding the purity of preparation and the high quality and preciousness of the ingredients used at the time of making them, is another staring defect on the part of the manufacturers and pharmacists of Ayurvedic medicines.

Persistence in expensive medicinal treatment in cases where surgical treatment is productive of quicker results with less expenditure is another very potent cause of the downfall and increasing unpopularity of the Ayurvedic system of treatment in the land of its birth where other systems of medicines than Ayurveda are daily gaining increasing grounds at the expense of the Indian system of medicine.

A regular want of hospital and nursing home facilities to be given to patients desirous of taking treatment outside home is another very glaring defect of the Ayurvedic method of treatment.

Want of a teaching institution like a college of pharmacology with arrangements for giving instructions in the method of making medicines to the studenrs, whose expert knowledge as chemists, is being utilised by the manufacturers of Ayurvedic medicines all over the country, is another very glaring defect in the Ayurvedic world.

Want of a standardised pharmacopea making arrangements for preparing and selling the same kinds of medicines everywhere in the Republic of India and outside, is another very glaring defect standing in the way of its popularity and development in the society of rising teeming millions of India who naturally want to buy same kinds of medicines with same prices in every nook and corner of the Republic of India.

Want of a strict vigilence in respect of the supply of genuine medicinal ingredients by sellers of the Bazar medicines is another very important defect among the chemists, druggists, appothecaries, pharmacists and manufacturers of Ayurvedic medicines as the efficacy or otherwise of the medicines depends largely upon the genuine-

ness of the ingredients supplied to the pharmacologists.

Want of research institutions in different parts of the Republic of India for the ascertainment of the genuine medicinal ingredients and their successful applications as medicines on different types of ailing patients in all quarters of the country, is the most palpable drawback of the Ayurvedic system of treatment.

There is no fixity of syllabus and curriculum of Ayurvedic Studies in the different states of the Republic of India. So, the Ayurvedic graduates coming out of these institutions are not possessed of the same equal standard of proficiency. As Ayurvedic teaching institutions are not provided with hospitals consisting of beds for different types of patients who give opportunities to both the teachers and the students for the acquisition of varieties of both theoretical and practical knowledge in the diagnosis and treatment of such obstinate cases as Apendicitis, Enlarged Prostrate, Strangulation, Stone, Gastric ulcer, Colic, Asthma etc., it is a serious hindrance to the path of the progress of Ayurvedic treatment among the rising teeming millions of India.

Another grave charge against the Ayurvedists is that they prepare medicines short of the required ingredients mentioned in the original list prepared by the Purvacharyas and as such they do not get the adequate benefit derivable from the medicines thus prepared. They do not also sit in consultation with other co-practitioners at the time of treating a difficult case. And there is no feeling of sympathy and respect amongst themselves and everybody is inimically disposed to every other body and becomes aggrieved at heart whenever he happens to see anybody belonging to his own community prosper in life and profession. Instead of having a co-operative attitude he tries to satisfy his private grudge against him by vilifying him publicly in the course of his professional dealings with men. (?)

Although Ayurvedic Tantras and Samhitas are the outcome of Tatvidya-Sambhasha or a meeting of experts in the science of Ayurveda on a particular subject of special significance, it has of late received no impetus in the hands of the modern practitioners of Ayurveda and further culture of the science in the cause of its development has received a great setback due to want of the interchange of ideas and facts regarding practical experience of the problems encountered in the course of daily practice.

A feeling of animosity and distrust existing between the caste Vaidyas and non-caste Vaidyas in the states of India also acts as a bar to the progress of Ayurveda. And this leads to concealment of experience amongst the members of a particular group which

ultimately curbs the progress of the science and serves to confine it into the group of a selected few. (৭)

But the greatest hindrance to Ayurvedic development has come from the whirlpool of the mixed course of Ayurvedic study from the beginning of students Ayurvedic career in the college which serves to detach their mind from the love of Ayurvedic lore and diverts their attention to the study and culture of the western medical science instead of Ayurveda to specialise in a study of which the students entered the college of Ayurveda. Without entertaining a genuine love for a science, it is virtually impossible on the part of a sincere student to try to excel in the study and culture of that science. As a result of the study of the mixed course for the last 50 years the students have developed in their minds a greater love for the western medical science than for the eastern which is universally recognised to be the parent body of all medical sciences of the modern world.

The Republic of India is at present in dire need of expert Ayurvedists entertainiug a genuine love for its perusal and culture and capable of shouldering the responsibilities of genuine teachers who would be able to expound the contents of the original Ayurvedic texts with standard commentaries lying unperused during a period of last 50 years to utter neglect and detriment of the science as a whole.

The above is a doleful picture of a very highly developed science of India which has been cultured and researched in India since the earliest dawn of civilisation. India stands urgently in need of its early unheaval from the quagmire of innumerable drawbacks heaped upon it as a result of the long-continued absence of state support and presence of state connivence firstly due to loss of the Hindu Dynasties of India and secondly, due to the influx of antagonistic culture wrongfully thrust upon her from outside with a view to uprooting it from the land of its birth.

সূক্তি রত্নমালা

প্রাণাচার্য

গ্রীষ্মবর্জেষু কালেষু দিবাস্বপ্নাৎ প্রকুপ্যতঃ।
শ্লেষ্মপিত্তে দিবাস্বপ্নস্তস্মাদন্যেষু নেষ্যতে। ২৫
মেদস্বিনঃ স্নেহনিত্যাঃ শ্লেষ্মলাঃ শ্লেষ্মরোগিণঃ।
ঘূষীবিষাশ্চ দিবা ন শয়ীরন্ কদাচন। ২৬

চ-সূ-২১ অঃ

গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য ঋতুতে কফ ও পিত্ত দিবানিদ্রাহেতু কুপিত হয়। এই জন্য ঐ সকল ঋতুতে দিবানিদ্রা প্রশস্ত নয়।২৫। মেদস্বী মেদসেবাপরায়ণ শ্লেষ্মপ্রধানধাতু শ্লেষ্মরোগগ্রস্ত ও সর্পবিষ ব্যক্তিগণ কখনও দিবসে নিদ্রা যাইবে না। ২৬

রসায়নী বিদ্যা

কবিরাজ শ্রীসুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যশাস্ত্রী

(১৩৭২-কার্তিক সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

তত্ত্বদর্শিগণ যাহারা পরম তত্ত্ব দেখিয়াছেন, সেই সকল পণ্ডিতগণ যে সকল ঔষধ বলিয়াছেন তাহা সাধ্য রোগ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে—'বহুক্তং সাধনং নৃণামসাধ্যানাং ব্যাধিনা মুপেক্ষতে।' কিন্তু রসৌষধ অসাধ্য রোগেও প্রযুক্ত হয়। কারণ, 'রসোত্তমশ্রেষ্ঠঃ উচ্যতে।'—এই জন্যই রসকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যদি রসৌষধ প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার রোগ দূর হয় তাহা হইলে সকল রোগই সাধ্য হইতেছে একথা বলা চলে না। অসাধ্য রোগ দুই প্রকার, এক যাপ্য ও অন্য অপ্রতিক্রিয়—উভয় স্থলে রসৌষধ প্রয়োগ করিলে ব্যাধি যাপ্য হইবে কিন্তু নিঃশেষে দূর হইবে না, ইহাই বুঝিতে হইবে। রসের মূর্চ্ছা বা মূর্চ্ছনা—সেই ক্রিয়া যাহার করা হইয়াছে তাহাই মূর্চ্ছিত পারদ। এই মূর্চ্ছনা দুই প্রকার—এক নির্গন্ধ মূর্চ্ছনা, অপর সগন্ধ মূর্চ্ছনা।

বহির্ধূম—মূর্চ্ছনা—'ষড়্‌গুণ বলিজারিত জারণ রূপঃ নির্ধূম মূর্চ্ছনা কজ্জলী রূপঃ এবং অন্তর্ধূম মূর্চ্ছনা রসসিন্দূরাদি রূপঃ। এবংবিধ পারদ-ব্যাধিঘাতক সর্বব্যাধি নাশকঃ।'

বদ্ধপারদ—বন্ধনপ্রাপ্ত স্বাভাবিক দ্রবত্বেসতি বহ্নিনাসুচ্ছীয়মানত্বং মূর্ত্তিবন্ধত্বং তত্ নিত্যমানে নিয়মো পায়ৈঃ সংস্কারৈ র্ভবতি। বন্ধনঞ্চ মুখ্যতয়া দ্বিবিধম্—নির্বীজ-বদ্ধোবীজ বদ্ধশ্চ। নির্বীজ বদ্ধো যথা—রসস্য পাদাংশ সুবর্ণ জীর্ণৈঃপিষ্টীকৃতো গন্ধকঃ যোগতঃ তুল্যাংশগন্ধৈঃ পুটিতক্রমেন নির্বীজ-নামাধিন রোগহন্তা।

বীজ বদ্ধঃ—বীজীকৃতৈ রভ্রক সত্ত্বহেম তারার্ক-ক্ষারৈঃ সহ সাধি তোয়ঃ। মুতন্তত :—ষড়্‌গুণ গন্ধ-চূর্ণৈঃ সবীজ বদ্ধোঽধিক প্রকারঃ।

খেচরতাং যন্তে—খেচর শব্দের অর্থ পক্ষী অর্থাৎ আকাশ গমন শক্তি লাভ করে।

বদ্ধ পারদ সেবনে মুক্তি লাভ হয়, রসেন্দ্র—রসানা মিশ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ, যদ্বক্তং সূতং সূতে বলারোগ্যস্য।

১। শিববীজ, শিবরেজ, শিববীর্য—শিব-শরীর হইতে সর্ব ধাতুর তৈজস পদার্থ নির্গত হইয়া পারদরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া শিবতেজ বলা হইয়াছে। নামান্তর—দেহময়ী সিদ্ধি জীব মুক্তি, লৌহময়ী সিদ্ধি—কৃত্রিম স্বর্ণাদি প্রস্তুত।

(২) রস—রসানাং সর্বধাতূনাম্ রস ইত্যভিধীয়তে। সর্ব ধাতুকে গ্রাস করে, কিন্তু লৌহ ভিন্ন সকল ধাতুকে বুঝিতে হইবে।

(৩) সূত—সার্থে কপ্রত্যয়।

(৪) পারদ—পারং গচ্ছতি রোগেভ্যঃ ইতি।

(৫) রসেন্দ্রক—সার্থে কপ্রত্যয়।

অথ রসলক্ষণ—রসপর্যায় বলিয়া তদনন্তর রসলক্ষণ বলা যাইতেছে। রসলক্ষণ বলার উদ্দেশ্য এই যে ঔষধার্থে যে পারদ গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বিশুদ্ধ হওয়া চাই। পারদে যে যে লক্ষণ থাকিলে তাহা বিশুদ্ধ এবং যে যে লক্ষণ থাকিলে তাহা অবিশুদ্ধ তাহার জ্ঞান না থাকিলে অবিশুদ্ধ পারদ বিশুদ্ধ পারদ ভ্রমে ব্যবহৃত হইয়া অপকার করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে পারদের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

রস লক্ষণ বলিবার পূর্বে পারদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই জন্য রসলক্ষণের মধ্যেই ইহা বলা হইতেছে। ধাতব অবস্থায় পারদ অতি সামান্য পরিমাণে খনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সচরাচর ইহা গন্ধকের সহিত মিশ্রিতাবস্থায় হিঙ্গুল-(cinna bar) রূপে খনিতে পাওয়া যায়। হিঙ্গুল দগ্ধ করিলে পারদ বাষ্পাকারে বিযুক্ত হইয়া উড়িয়া যায়—এই বাষ্পকে মাটির নলের মধ্যে শীতল করিলে তরল পারদ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে কাশ্মীরের অন্তর্গত দরদিস্থান নামক পার্বত্য প্রদেশ হিঙ্গুলের আকরের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং দরদ শব্দও দরদিস্থান হইতে হইয়াছে ('রস রত্ন সমুচ্চয়ে' দরদ দেশে পারদের উদ্ভব বলিয়া লিখিয়াছেন—পতিতো দরদে দেশে সৌরসাদ্ধহি বস্তুতঃ সরসো ভূতলে নীল স্তত্তদ্দেশ-নিবাসিনঃ॥ তাদৃশং পাতন যন্ত্রেক্ষিপ্তং সূতং হরন্তিচ॥

অন্তঃ সুনীল—পারদের স্বরূপ শোভা নীল বর্ণের আভাবিশিষ্ট শ্যাম বর্ণবিশিষ্ট।

বহিরুজ্জ্বল—বাহ্য দেশ উজ্জ্বল—মধ্যাহ্ন সূর্য-প্রতিম প্রকাশ মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবংবিধ পারদ, তরল, গুরু—আর যাহা ধূম্র বর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ লোহিত মিশ্রিত বর্ণ, ছাইয়ের বর্ণ বিশিষ্ট, অন্তঃসুনীলত্ব নাই। এবংবিধ পারদ প্রযোজ্য নহে। অথ রসস্থিত দোষ—রস লক্ষণ বলার পর তাহার দোষ বলা যাইতেছে। পারদের এই আটটী দোষ স্বাভাবিক, যথা—

নাগদোষ, বঙ্গদোষ, মলদোষ, বহ্নিদোষ, চাঞ্চল্য দোষ, বিষদোষ এবং অসম্ভাব্যি দোষ:

১। নাগদোষ—নাগ শব্দের অর্থ সীসক—পারদের সহিত সীসক সম্মিলিত থাকিয়া পারদের যে কলুষ উৎপাদন করে তাহাকে নাগদোষ বলা হয়।

২। বঙ্গদোষ—বঙ্গ শব্দের অর্থ "রাঙ্" পারদের সহিত রাঙ্ সম্মিলিত থাকিয়া পারদের যে কলুষতা উৎপাদন করে তাহাকে বঙ্গদোষ বলে।

(৩) মলদোষ—পারদের সহিত নানাবিধ মলিন পদার্থ সংমিশ্রিত থাকিয়া পারদের যে কলুষতা উৎপাদন করে তাহার নাম মলদোষ।

(৪) বহ্নিদোষ—পারদ একটী তৈজস পদার্থ। ইহাতে স্থিত তেজজন্য দোষ শরীরের অপকার করে বলিয়া ইহা একটী দোষ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

(৫) চাঞ্চল্য দোষ—পারদ স্বভাবত চঞ্চল বলিয়া দুর্গান্ধ এবং শরীরের অপকারী বলিয়া ইহাকে পারদের একটী দোষ বলা হইয়াছে।

(৬) বিষ দোষ—পারদ একটী বিষদ্রব্য, সেই জন্য ইহা সেবনে শরীরের অপকার হয়—এই জন্য ইহাকে পারদের একটী দোষ বলা হইয়াছে।

(৭) গিরিদোষ—গিরি শব্দের অর্থ—পর্বত। পারদ পার্বত্য ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া শিলাজতু, গৈরিক প্রভৃতি পার্বত্য দ্রব্যের সংস্রব পারদকে দোষযুক্ত করে—এই জন্য ইহাকে একটী দোষ বলা হইয়াছে। গৃ ধাতু হইতে গিরি শব্দ—ইহা দ্বারা গুরুত্ব একটি দোষ বলা হয়। নাগ, বঙ্গ, মল এবং গিরি পর্বত অর্থে গৃহীত হয়। তাহা হইলে ইহাদিগকে কি প্রকারে নৈসর্গিক দোষ বলা যাইতে পারে?

স্বাভাবিক দোষ—পারদের সহিত আকরিক দ্রব্যের মিশ্রণ।

ঔপাধিক দোষ (কঞ্চুক) উপাধিজন্য পারদের সকল দোষ জন্মে। উহাদিগকে ঔপাধিক দোষ বলা যায়।

কৃত্রিম দোষ—পারদের সহিত রাং, সীসা, মিশাইয়া কৃত্রিম পারদ উৎপাদন করে।

রসেন্দ্র সারসংগ্রহে পারদের ৮টী দোষের উল্লেখ আছে—দোষযুক্ত পারদ বিষ—অশুদ্ধ পারদ শরীরের নানাপ্রকার অপকার সাধন করে।

'অশিচ শুদ্ধেঽয়ং সাক্ষাদমৃতম্।' সেই জন্য শ্রেষ্ঠ বৈদ্যগণ পারদের সীসকাদি দোষের শোধন করিয়া ব্যবহার করিবেন।

পারদের শুদ্ধি—দুইপ্রকার (১) ব্যাধি আরোগ্যের জন্য শুদ্ধি, (২) রসায়নজন্য শুদ্ধি।

এক্ষণে কি পরিমিত পারদ গ্রহণ করা উচিত তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইতেছে—

পলানাং শত মাত্রকম্—একশত পল ৮০০ তোলা, বাজার ওজন ১০ সের—আয়ুর্বেদ মতে—৬৪ তোলায় সের ধরিয়া ১২॥০ সের—৫০ পল ৬।০ সের।

অথবা ২৫ পল—/৩৵০।

দশ পল—৮০ তোলা—পাঁচ পল ×০ তোলা।

এক পল—৮ তোলা

ইহার পরে পারদের শোধন প্রভৃতি বলা হইবে।

(ক্রমশঃ)

বিচিত্র প্রসঙ্গ

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞান বিভাগ

বিগত ২৭শে আশ্বিন, ১৩৭৩, ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতায় বিজ্ঞান বিভাগের অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীনগেন্দ্র নাথ ন্যায়াচার্য 'আয়ুর্বেদের দার্শনিকতা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে মাননীয় বক্তা দ্রব্যের সামান্য-বিশেষ, গুণ, কর্ম, সমবায় প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণ করেন। গুণের সংখ্যা বিশ হইতে বাট পর্যন্ত। তিনি বিকৃতির নীতি ও তাহার দোষ বিকলন ও দেহের ক্ষমতারক্ষার নীতিরও উল্লেখ করেন। সামান্য শব্দের বৈশেষিক ও ন্যায়শাস্ত্রে প্রয়োগ অপেক্ষা আয়ুর্বেদে ভিন্ন—আয়ুর্বেদে উহা সমগুণের বৃদ্ধি-করণ বুঝায়। তিনি আরও বলেন—জীবন ও দ্রব্যে আয়ুর্বেদের নীতির বিশ্লেষণের ব্যবহার চিকিৎসার তাৎপর্য প্রকট করে।

কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীঅরবিন্দ নাথ চট্টোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীললিত মোহন শর্মা প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান করেন। উপসংহারে সভাপতি কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার বলেন—মহর্ষি চরকের সৃষ্টিতত্ত্ব, দ্রব্যের গঠন ও গুণাবলীর বিশ্লেষণ আয়ুর্বেদের মৌলিক ভিত্তি। সুতরাং বক্তার আলোচনায় আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বিজয়া সম্মিলনী

বিগত ২৫শে কার্তিক, ১৩৭৩, ৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতায় আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের বার্ষিক বিজয়া-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। আয়ুর্বেদের বর্তমান অবস্থা ও উন্নতির উপায়, পরিষদের কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় কবিরাজ শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার, কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষ, কবিরাজ শ্রীগিরিজা শঙ্কর সান্যাল, কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র নাগ, শ্রীতেজেন্দ্র নাথ সরকার, শ্রীসুভাষ চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ দাশগুপ্ত প্রভৃতি যোগদান করেন। পরিশেষে মিষ্টদ্রব্য ভোজনে সকলে পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

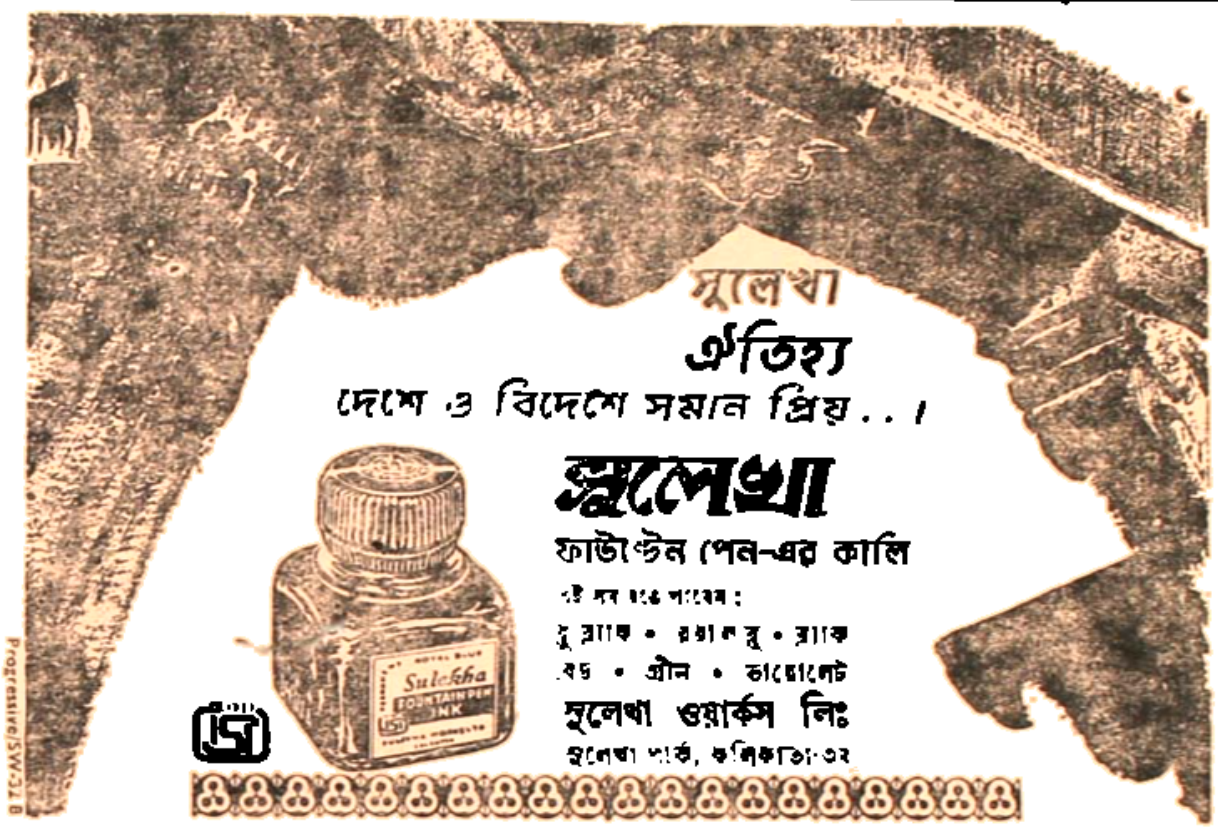

Statement about ownership and other particulars about newspaper

"Ayurveda-Bharati"

FORM IV

1. Place of Publication ..... 52, Mahatma Gandhi Road. Cal.-9
2. Periodicity of its Publication ..... Quarterly.
3. Printer's Name ..... Kaviraj Bagala K. Majumdar, M.A.
   Nationality ..... Indian (Bengalee).
   Address ..... 52, Mahatma Gandhi Road, Cal.-9
4. Publisher's Name ..... Kaviraj Bagala K. Majumdar, M.A.
   Nationality ..... Indian (Bengalee).
   Address ..... 52, Mahatma Gandhi Road, Cal.-9
5. Editor's Name ..... Kaviraj Bagala K. Majumdar, M. A.
   Nationality ..... Indian (Bengalee).
   Address ..... 52. Mahatma Gandhi Road, Cal.-9.
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital.

   Kaviraj Bagala K. Majumdar, Founder-President, Ayurveda Bijnan Parishad 52, Mahatma Gandhi Road, Cal.-9.

I, Bagala K. Majumdar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date – 25.5.68

Signature of Publisher—
Bagala Kumar Majumdar,
Founder-Editor, Ayurveda-Bharati.

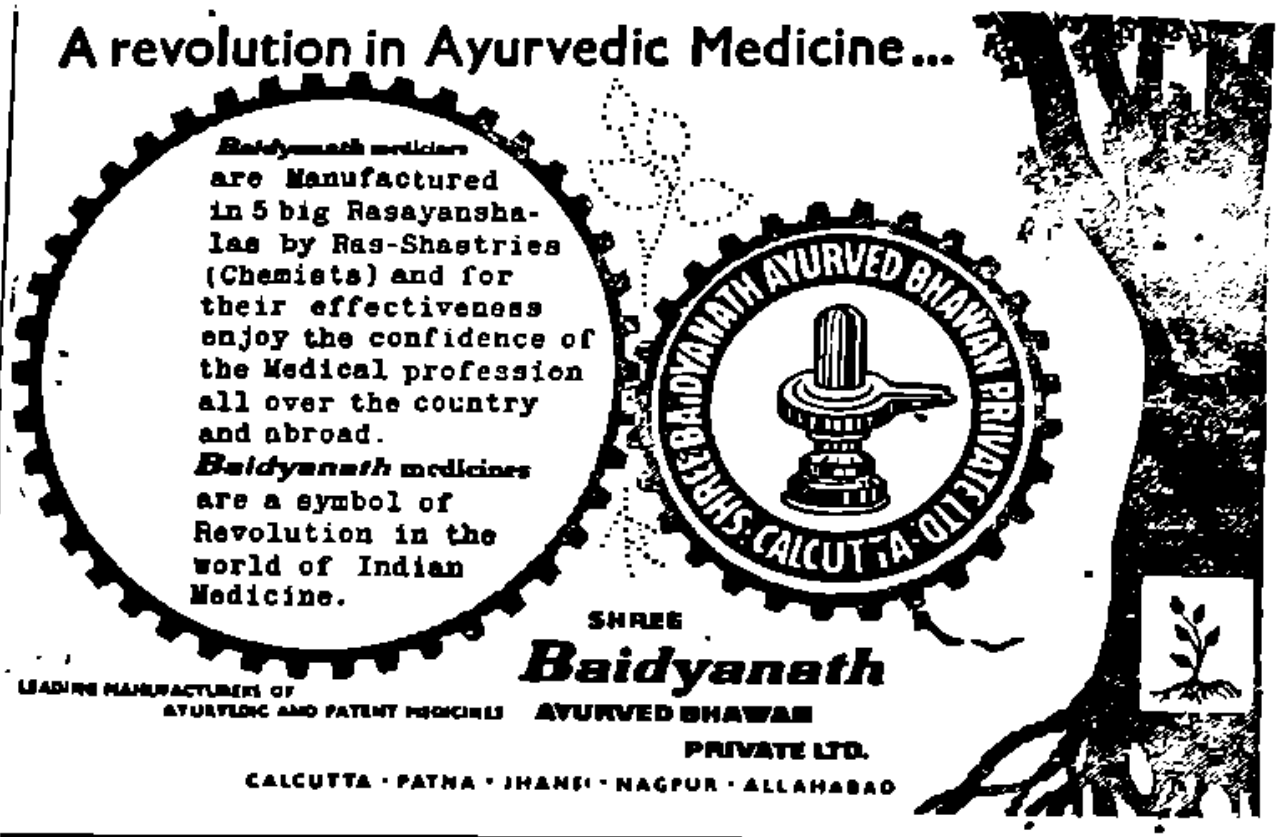

আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দ্বৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। উহার আকার ৳ ডবল ক্রাউন। ইহাতে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

প্রচ্ছদ পট :

প্রথম অর্ধাংশ পৃষ্ঠা—	১৫০৲	সাধারণ পৃষ্ঠা—	১৫০৲
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা—	২৫০৲	সম্পাদকীয় স্তম্ভ বা অন্যান্য	
তৃতীয় পৃষ্ঠা—	২৫০৲	প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ	
চতুর্থ পৃষ্ঠা—	৩০০৲	বিশেষ স্থানের হার—	
		২০০৲ বা তদূর্ধ্ব	

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে কথাবার্তা ও পত্রালাপ পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার সঙ্গে আংশিক দেয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা সাময়িক বিজ্ঞপ্তি-হিসাবে প্রকাশিত হইল।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক,
আয়ুর্বেদ-ভারতী।

AN APPEAL

The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its seventh year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. The articles bear testimony to the vast lore of Ayurveda and its unique exposition of the Indian system of Medicine and research that were carried on throughout the centuries—the checkered cultures of India. To support and subscribe it is to help & uplift the science of Ayurveda as well as the Indian mind and spirit.

Founder-Editor, Ayurveda-Bharati.
Office : 52, Mahatma Gandhi Rd. Cal.-9

The 'Ayurvda-Bharati'is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Patuatola Lane, Calcutta-9 and published by him from 52 Mahatma Gandhi Road Calcutta-9